POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ط
قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ

এবং তোমার জাতি ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,অথচ ইহাই সত্য; তুমি বল, ‘ আমি তোমাদের উপর কোন অভিভাবক নহি।’

(আল আনআম: ৬৭)

بسم الله الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلّی علیٰ رسولہ الکریم وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

সংখ্যা 42

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 17 Oct, 2024 13 রবিউল সানি 1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

অনুমতি না পেলে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ।

২০৬২) উবায়েদ বিন উমায়ে এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয় নি। হয়তো (হযরত উমর) কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হযরত আবু মুসা ফিরে যান। এর মধ্যে হযরত উমরের কাজ শেষ হলে তিনি বললেন, ‘আমি কি আব্দুল্লাহ বিন কায়েস (আবু মুসা)-র কণ্ঠ শুনেছিলাম? তাঁকে ভিতরে আসার অনুমতি দাও। তাঁকে বলা হল তিনি তো ফিরে গেছেন।অতঃপর হযরত উমর (রা.) তাঁকে ডেকে পাঠান (এবং জিজ্ঞাসা করেন) তখন (হযরত আবু মুসা) বললেন, আমাদেরকে এই আদেশই দেওয়া ছিল (যখন অনুমতি না পাবে, তখন ফিরে যাবে)। তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, আপনাকে এ বিষয়ের সাক্ষী জোগাড় করতে হবে।’এরপর তিনি আনসারদের মজলিসে গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল- এ বিষয়ে কেউ আপনার জন্য সাক্ষী দিবে না, কিন্তু সেই ব্যক্তি যে আমাদের মধ্যে সব থেকে স্বল্প বয়স্ক। অর্থাৎ আবু সাঈদ খুদরী (রা.)। তখন তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা.)কে সঙ্গে করে নিয়ে যান। (তাঁর কথা শুনে) হযরত উমর বললেন: রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই নির্দেশটি কি আমার অগোচরে থেকে গিয়েছিল? বাজারের কেনাবেচা আমাকে উদাসীন করে রেখেছিল। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ব্যবসা বাণিয্য সূত্রে তিনি বাইরে যেতেন।

(সহী বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়ু)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৬ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

মানুষের অন্তর অর্থাৎ ‘রিবাত’ও প্রশিক্ষিত হওয়া দরকার। আর তার শক্তিবৃত্তির বিচরণ যেন আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যেই বাঁধা থাকে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

রিবাত-এর অর্থ

‘রিবাত’ ঐ সকল ঘোড়াদেরকে বলা হয় যেগুলি শত্রু সীমানার প্রান্তে বাঁধা থাকে। আল্লাহ্ তা'লা সাহাবাদেরকে শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন আর এখানে ‘রিবাত’ শব্দের দ্বারা তাদেরক সবদিক থেকে যথাযথ প্রস্তুতির গ্রহণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তাদের উপর দুটি দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এক বাহ্যিক শত্রুর মোকাবেলা করা, আর দ্বিতীয়ত আধ্যাত্মিক যুদ্ধ। অভিধানে লেখা আছে, রিবাত শব্দ দ্বারা হৃদয় ও আত্মাকেও বোঝানো হয়। আরও একটি সূক্ষ্ম বিষয় লক্ষ্যনীয় এই যে, একমাত্র প্রশিক্ষিত ঘোড়াই কাজে আসে। বর্তমান যুগে ঘোড়াদের এমনভাবে প্রশিক্ষন দেওয়া হচ্ছে যেভাবে বাচ্চাদেরকে স্কুলে যত্ন সহকারে শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। যদি তাদেরকে প্রশিক্ষন না দেওয়া হয়, তারা নিষ্কর্মা হয়ে পড়ে, আর কল্যাণকর না হয়ে ভয়াবহ ও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়।

এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের অন্তর অর্থাৎ ‘রিবাত’ও প্রশিক্ষিত হওয়া দরকার। আর তার শক্তিবৃত্তির বিচরণ যেন আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা মধ্যেই বাঁধা থাকে। আর যদি এমনটি না হয়, তবে সে ঐ সব যুদ্ধের কাজে আসতে পারবে না যা প্রতিটি মূহুর্তে মানুষ ও তার চিরশত্রু শয়তানের সঙ্গে আভ্যন্তরীণভাবে লেগে আছে। যেরূপে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ময়দানে শারিরিক শক্তির পাশাপাশি প্রশিক্ষিত হওয়াও জরুরী, অনুরূপভাবে এই অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ ও সংগ্রামের জন্য মানুষের মনকে প্রশিক্ষিত করা এবং উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যক। আর এমনটি না হলে শয়তান তার উপর বিজয়ী হবে আর খুব খারাপভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হবে। উদাহরণ স্বরপ কোন ব্যক্তি যদি নিজের অস্ত্রভান্ডারে তোপ, গোলা, ও বিভিন্ন প্রকারের বন্দুক রাখে কিন্তু চালানোর পদ্ধতি না জানে, তবে সে শত্রুর মোকাবেলায় কখনও সফল হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি বন্দুক ও বিভিন্ন যুদ্ধস্ত্রে সুসজ্জিত হয় এবং সেগুলি চালনা করতেও জানে, কিন্তু যদি তার বাহুতে শক্তি না থাকে, তবে এমন ব্যক্তিও অসফল হবে। এর থেকে বোঝা গেল যে, কেবল ব্যবহারের পদ্ধতি আয়ত্ব করলেও তা কাজে আসতে পারে না, যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি শারিরিক কসরত ও অনুশীনের মাধ্যমে বাহুপেশি গুলিকে সবল ও বলিষ্ঠ না করে তোলে। আবার যদি এক ব্যক্তি তরবারি চালনা করতে জানে, কিন্তু কসরত ও অনুশীলন করে না, তবে এমন ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে তিন-চার বার তরবারি চালনা ও কয়েকটি ঘা দেওয়া মাত্র তার বাহু নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে এবং ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে অকেজো হয়ে পড়বে। আর অবশেষে নিজেই শত্রুর শিকারে পরিণত হবে।

আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও সাধনা

অতএব ভালভাবে বুঝে যাও, কেবল জ্ঞান ও কৌশল এবং থিয়োরিটিক্যাল প্রশিক্ষণ কোন কাজে আসে না। যতক্ষণ এগুলির সঙ্গে বাস্তবায়বন, প্রচেষ্টা এবং অনুশীলন সংযুক্ত না হয়। তাই লক্ষ্য করা উচিত যে, ঠিক এই কারণেই সরকার সেনাবাহিনীকে অলসভাবে বসে থাকতে দেয় না। এমনকি শান্তি ও স্বাচ্ছন্দের দিনগুলিতে কৃত্রিম যুদ্ধাভ্যাস করিয়ে সেনাকে ব্যস্ত রাখে। এছাড়াও সঙ্গে দৈনন্দিন অনুশীলন ও প্যারেড তো আছেই।

যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, যুদ্ধের ময়দানে সফল হতে হলে একদিকে যেমন অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষন ও জ্ঞান থাকা দরকার, অন্যদিকে অনুশীলন ও কায়িক পরিশ্রমকে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কাজে লাগানোও ভীষণভাবে প্রয়োজন। এছাড়াও যুদ্ধ প্রাঙ্গণে চাই প্রশিক্ষিত ঘোড়া-এমন ঘোড়া যারা তোপ ও বন্দুকের শব্দে ভয় পাবে না আর ধুলোবালির প্রকোপে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলেও বিশৃঙ্খল হয়ে পিছিয়ে আসবে না, বরং ক্রমশ এগিয়েই চলবে। অনুরূপভাবে মানুষের মনও কঠোর অনুশীলন, নিরলস পরিশ্রম ও সর্বোত্তম প্রশিক্ষন ছাড়া আল্লাহ্‌র শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে সফল হতে পারে না।

আরবী ভাষার বৈশিষ্ট্য

আরবী ভাষা অনন্য ও অতুলনীয়। উপরোক্ত আয়াতে যে রিবাত শব্দটি এসেছে সেটি একদিকে যেমন জাগতিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং যুদ্ধের কলা-কৌশলকে নির্দেশ করে, তেমনি অপরদিকে মানুষের অভ্যন্তরে চলতে থাকা আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও সাধনার বৈশিষ্টকেও প্রকাশ করে। এটি এক অসাধারণ বিষয়। এই কারণেই আরবী ভাষা হল ‘উম্মুল আলসিনা’ বা ভাষাসমূহের জননী। এর দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ করা যায়, তা অন্য কোন ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইনশাআল্লাহ্ এই তত্ত্বজ্ঞান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সকল সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকেও আমার পুস্তক ‘মিনানুর রহমান’ পুস্তকে প্রকাশিত হবে, যা ইদানিং আমি আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেটিকে ‘উম্মুল আলসিনা’ বা ভাষাসমূহের জননী হিসেবে প্রমাণ করার জন্য লেখা আরম্ভ করেছি। এর থেকে বোঝা যাবে যে, এ বিষয়ে ইউরোপিয়ানদের গবেষণা ত্রুটিটে ভরা এবং একেবারেই অসম্পূর্ণ। আর তারাও জেনে যাবে যে, ভাষাসমূহের হারিয়ে যাওয়া মাকে খুঁজে পাওয়া গেছে, যেরূপে অন্যন্য ধর্মীয় সত্যতা উন্মোচিত হয়েছে। আরবীই হল সেই হারিয়ে যাওয়া ভাষা। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৭-৪৯)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আমি খুতবা জুমায়ও বলেছিলাম যে, এম.টি.এ-এর মাধ্যমে প্রত্যেক বাড়িতে আমার খুতবা পৌঁছে যাচ্ছে, প্রত্যেকেই শুনতে পারে। এর অর্থ এই ছিল যে, অন্ততপক্ষে জুমার খুতবা যেন শুনে। আর যদি এটিও সম্ভব না হয় তবে খুতবার সংক্ষিপ্তসার তৈরী করে ডেনিশ ভাষায় অনুবাদ করে লাজনা সদস্যাদের কাছে পৌঁছে দিন। হুযুর আনোয়ার বলেন, খুতবার অনুবাদ যদি ডেনিশ ভাষায় করা সম্ভব না হয় তবে আপনাদের মুরুব্বী সাহেবের কাছ থেকে সেটি সংগ্রহ করে লাজনাদের কাছে পৌঁছে দিন। সদ্য যৌবনে পদার্পণকারী যুবক ও যুবতী উভয়কেই যেন মহিলরাই নিয়ন্ত্রণ করেন। পুরুষ এ কাজ করতে অক্ষম। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) তরবিয়তের বিষয়টি মহিলাদের দায়িত্বে অর্পন করেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, মায়েদের পায়ের নীচে জান্নাত রয়েছে, এটি তরবীয়তের কারণেই বলেছেন। আর শুধুমাত্র মেয়েদের তরবীয়তের কারণে বলেন নি বরং ছেলেদের তরবীয়তের কারণেও বলেছেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র আমেলা সদস্যাদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের মিটিং

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারী তরবীয়তের কাছে তাদের কর্মসূচির বিষয়ে জানতে চান। হুযুর আনোয়ার তাদেরকে নির্দেশনা দিয়ে বলেন, লাজনা সর্বপ্রথম সকলকে নামাজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করুন এবং এর পর কুরআন করীম তিলাওয়াতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করুন। মায়েদেরকে বলে দিন তারা বাড়িতে নামায ও তিলাওয়াত করবেন। এই দু'টি আবশ্যিক এবং মৌলিক বিষয়। এছাড়া তারা যেন বাড়িতে এম.টি.এ দেখে এবং ছোটদেরকেও দেখায়। এম.টি.এ-র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি খুতবা জুমায়ও বলেছিলাম যে, এম.টি.এ-এর মাধ্যমে প্রত্যেক বাড়িতে আমার খুতবা পৌঁছে যাচ্ছে, প্রত্যেকেই শুনতে পারে। এর অর্থ এই ছিল যে, অন্ততপক্ষে জুমার খুতবা যেন শুনে। আর যদি এটিও সম্ভব না হয় তবে খুতবার সংক্ষিপ্তসার তৈরী করে ডেনিশ ভাষায় অনুবাদ করে লাজনা সদস্যাদের কাছে পৌঁছে দিন। হুযুর আনোয়ার বলেন, খুতবার অনুবাদ যদি ডেনিশ ভাষায় করা সম্ভব না হয় তবে আপনাদের মুরুব্বী সাহেবের কাছ থেকে সেটি সংগ্রহ করে লাজনাদের কাছে পৌঁছে দিন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তরবিয়্যতী বিভাগে এম.টি.এ-র সেক্রেটারী এবং ইশা'ত-এর সেক্রেটারি একত্রে প্রোগ্রাম তেরী করে এবং খোঁজ নিয়ে দেখতে পারে যে, এই সপ্তাহে বা এই মাসে এম.টি.এ-তে কি কি অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে, এগুলির মধ্যে কোন কোনটি তাদের জন্য উপযোগী হতে পারে এবং লাজনাদেরকে দেখানো যেতে পারে। যারা উর্দু বোঝে না তাদেরকে ইংরেজিতে শোনানোর ব্যবস্থা করুন। যারা এখানকার স্থানীয় ভাষা জানে তাদেরকে এই দলের অন্তর্ভুক্ত করুন। এই কাজের জন্য টিম তৈরী করুন যাতে আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সদ্য যৌবনে পদার্পণকারী যুবক ও যুবতী উভয়কেই যেন মহিলরাই নিয়ন্ত্রণ করেন। পুরুষ এ কাজ করতে অক্ষম। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) তরবিয়্যতের বিষয়টি মহিলাদের দায়িত্বে অর্পন করেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, মায়েদের পায়ের নীচে জান্নাত রয়েছে, এটি তরবীয়তের কারণেই বলেছেন। আর শুধুমাত্র মেয়েদের তরবীয়তের কারণে বলেন নি বরং ছেলেদের তরবীয়্যতের কারণেও বলেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সদর লাজনা এবং তরবীয়ত সেক্রেটারীর কাজ হল প্রথমে সমস্যাকে ভাল করে বোঝা এবং কিভাবে তার সমাধান করা যায় তার চিন্তা করা। যদি আপনারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে এম.টি.এ.-র প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে তরবীয়তের অর্ধেক কাজ বাড়িতে বসেই সম্পন্ন হয়ে যায়।

এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.) নাসেরাতের সেক্রেটারির নিকট নাসেরাতের সংখ্যা জানতে চাইলে সেক্রেটারি সাহেবা বলেন যে, মোট ৩৪ জন নাসেরাত আছে। হুযুর নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, তাদের জন্য ওয়াকফে নও-এর পাঠক্রমই যথেষ্ট। বর্তমানে ২১ বছর পর্যন্ত মেয়েদের জন্য পাঠক্রম তৈরী হয়ে গেছে। যদি এটি সমস্ত লাজনাদেরকে পড়ানো হয় তবে তা সকলের জন্যই যথেষ্ট।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বাচ্চাদের জন্য আগ্রহের উপকরণ তৈরী করুন। আপনারা নিজেদের প্রতিবেশী দেশের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। সেখান থেকে লাজনা ও নাসেরাতের দল লন্ডনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসে। আপনারাও লন্ডন আসার প্রোগ্রাম তৈরী করুন। মেয়েদের মায়েদের সঙ্গে মিটিং করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কথা বলার সময় বিনম্রতা অবলম্বন করুন। কুরআন করীমেও আল্লাহ তা'লা বিনম্রতা সহকারে কথা বলার আদেশ দিয়েছেন।

এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.) কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক সেক্রেটারি-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন মেয়েদেরকে হস্তশিল্পের কাজ শেখান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারি খিদমতে খালক-কে হিদায়ত দিয়ে বলেন, বড় মেয়েদেরকে ভাষা শেখান এবং তাদেরকে বয়স্ক মহিলাদের কাছে নিয়ে যান। তাদের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করুন। এই ভাবে তাদের কথা শুনে তারাও সেই ভাষা রপ্ত করে ফেলবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি যে আপনাদেরকে বিভিন্ন নির্দেশনা দিচ্ছি এগুলির ক্ষেত্রে অবহেলা করবেন না। শিক্ষিত মেয়েদেরকে নিজেদের সঙ্গে সামিল করুন। এবং এখানকার যারা এখানকার স্থানীয় ভাষা জানে তাদেরকে এই কাজে নিযুক্ত করুন।

শরীরচর্চা বিভাগের সেক্রেটারী কে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, লাজনাদেরকে সক্রিয় করুন। খেলাধূলার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করুন। যদি লাজনাদের হলঘর থাকে তবে সেখানে টেবিল টেনিস খেলার ব্যবস্থা করুন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রত্যেক সেক্রেটারীর একটি লক্ষ্য আছে, এবং কিছু কর্তব্য আছে। তাদের যথারীতি কর্মসূচি থাকা উচিত। এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারি যিয়াফত-কে তাঁর বিভাগ এবং কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারী তাজনীদ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ডেনমার্কে লাজনা এবং নাসেরাতের মোট সংখ্যা ২৩৯। অনুরূপভাবে সেক্রেটারী ইশা'ত বলেন যে, ডেনমার্কে প্রকাশনার বিশেষ কোন কাজ নেই। কোন পুস্তকাদি নিতে হলে তা বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয়।

রিপোর্ট উপস্থাপনকারী বলেন যে, তিনি সেক্রেটারী মালের সঙ্গে রসিদ গুলি নিরীক্ষণের কাজ করেন।

সেক্রেটারী মাল তার রিপোর্ট পেশ করে বলেন, আমাদের বাৎসরিক বাজেট ৫৬ হাজার ক্রোনার এবং বাৎসরিক ইজতেমার বাজেট ৯ হাজার ক্রোনার।

এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারী তবলীগকে বলেন যে, এখানে আরব অভিবাসীরাও রয়েছেন, সিরিয়ার মানুষও আছেন এবং পুরোনো মানুষও আছেন। পূর্ব ইউরোপ থেকে আগত মানুষরাও আছেন এবং স্থানীয় ডেনিশরাও আছেন। এদের সকলকে লক্ষ্য রেখে প্রোগ্রাম তৈরী করুন যে, কীভাবে এদেরকে তবলীগ করবেন, কীভাবে এদের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি করবেন এবং তাদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যদি এমন কোন বিভাগ বা কাজ থাকে যার লাজনাদের কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখ নেই, তবে সহায়ক সদর বানিয়ে সেই কাজ তার উপর ন্যস্ত করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ছাত্র সংগঠনের বিষয়ে জানতে চান এবং বলেন যে শিক্ষিত মেয়েদেরকে একত্রিত করুন। কাজ সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করুন। নিজেরাই এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করুন এবং তা জামাতের সঙ্গে সংযুক্ত করুন।

সেক্রেটারী তবলীগ লাজনাদের ব্যবস্থাধীনে ওপেন হাউসের উল্লেখ করেন। হুযুর বলেন: গাইডলাইন হিসেবে জিহাদ বিষয়ক আমার একাধিক প্রবন্ধ আপনারা পেয়ে যাবেন। আমি সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে পিস কনফারেন্সে ভাষণ দিয়েছিলাম, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উল্লেখ আপনারা তার মধ্যেই পেয়ে যাবেন। আমি সেই ভাষণে বেশ কিছু প্রফেসর, লেখক ও প্রমুখদের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছিলাম।

সেক্রেটারী তালীমের কাছে হুযুর আনোয়ার (আই.) জানতে চান যে, পাঠক্রম মেনে চলার জন্য কি কি কাজ হয়েছে? ২৩৯ জন লাজনাদের মধ্য থেকে ১১৬-১১৭ জনের কাছে যদি পাঠক্রম পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় তবে এটি বিরাট সাফল্য। সেক্রেটারী তালীম বলেন সমস্ত লাজনাদেরকে ই-মেলের মাধ্যমে পাঠক্রম পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া আসা চায় যে, তারা সেটি পড়েছে না পড়ে নি। প্রত্যেকের রিপোর্ট নেওয়া দরকার। কেবল পাঠিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ আপনি লাজনাদের সদস্যাদের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে সম্পর্ক স্থাপন না করবেন তারা জানতে পারবে না যে আপনি তাদের পদাধিকারীনি এবং তাদের প্রতিনিধি। যদি এই চেতনা তৈরী হয় যে, আপনি প্রত্যেকের প্রতি সহমর্মী তবে সম্পর্ক স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উন্নতি করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তালীম বিভাগের কাজ হল মেয়েদেরকে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবী সম্পর্কে স্পষ্ট করা যে, হযরত

এরপর ৬ পাতায়...

জুমআর খুতবা

আহযাবের যুদ্ধের সময় আবু সুফিয়ানের একটি চিঠির উত্তরে আঁ হযরত (সা.) তাকে লেখেন–
আর শোনো! পরিণতি দানকারী আল্লাহ্ আমাদের সফলতা দান করবেন এবং হে বনু গালেবের নির্বোধরা! স্মরণ রেখো, এমন দিন সন্নিকট যেদিন তোমাদের লাত, উযযা, আসসাফ, নায়লা ও হুবলকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আর সেদিন আমি তোমাদের এসব স্মরণ করাবো।
পরিখা খননের সিদ্ধান্ত হযরত সালমান ফার্সি (রা.)–এর পরামর্শের কারণে গৃহীত হয় নি, বরং আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আঁ হযরত (সা.) কে ইলহামের মাধ্যমে এই পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন।
আহযাবের যুদ্ধের কারণসমূহ, যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং বিবরণ
পাকিস্তান সহ সমগ্র বিশ্বের আহমদীদের জন্য দোয়ার প্রতি আহ্বান এবং পাকিস্তানের আহমদীদেরকে দোয়া ও সদকার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (৬ তবুক, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আজ আমি পরিখা বা আহযাবের যুদ্ধের উল্লেখ করব যা পাঁচ হিজরী অনুযায়ী ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে আহযাবের যুদ্ধের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে যে,

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ
جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا
﴿۱۰﴾ اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ
الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿۱۱﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا
﴿۱۲﴾ وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا
﴿۱۳﴾ وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ
النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿۱۴﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ
عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ﴿۱۵﴾ وَلَقَدْ كَانُوْا
عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا ﴿۱۶﴾ قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ
الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۷﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ
يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا
وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۸﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَ الْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا وَلَا
يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۹﴾ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ
اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً
عَلَى الْخَيْرِ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿۲۰﴾
يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ
يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۲۱﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ
اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿۲۲﴾ وَ لَمَّا رَاَ
الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ صَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ مَا زَادَهُمْ
اِلَّآ اِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًا ﴿۲۳﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ
قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿۲۴﴾ لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَ
يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۲۵﴾ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا وَ كَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَ كَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿۲۶﴾

(সূরা আহযাব: ১০–২৬)

এর অনুবাদ হলো, হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নেয়ামতকে স্মরণ করো যখন তোমাদের ওপর (হানাদার) বাহিনী আক্রমণ করেছিল তখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে এক ঝড়ো বায়ু প্রেরণ করি আর এমন এক বাহিনী প্রেরণ করি যাদের তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমরা যা কিছু করো তার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখেন।

তারা যখন তোমাদের ওপরের দিক থেকেও এবং তোমাদের নীচের দিক থেকেও তোমাদের ওপর আক্রমণ করে আর যখন চোখ ভয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিল ও প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানা রকম কুধারণা করছিলে, সেখানে মু'মিনদের পরীক্ষায় ফেলা হয় আর তাদেরকে কঠোর পরীক্ষার ঝাকুনি দেওয়া হয়। আর যখন মুনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বললো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।আর তাদের এক দল যখন বলেছিল, হে মদিনাবাসী! তোমাদের আর কোনো ঠাঁই নাই, অতএব তোমরা ফিরে যাও। আর তাদের এক দল এই বলে নবীর কাছে অনুমতি চাইতে আরম্ভ করে যে, নিশ্চয় আমাদের ঘরবাড়ি অরক্ষিত। অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। তারা কেবল পালাতে চাচ্ছিল। আর তাদের বিরুদ্ধে যদি সেই বসতির চারদিক থেকে আক্রমণ করা হতো, আর এরপর তাদেরকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য বলা হতো, তাহলে তারা অবশ্যই তা করত আর এক্ষেত্রে বিলম্ব করতো না, সামান্য ব্যতিরেকে। অথচ এর পূর্বে তারা নিশ্চয় আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে।তুমি বলে দাও, পলায়ন তোমাদের কোনো কাজে আসবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন করো। আর এমতাবস্থায় তোমাদের কেবল সামান্যই সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে দেওয়া হবে। তুমি জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ্র হাত থেকে কে তোমাদের রক্ষা করতে পারে যদি তিনি তোমাদের কোনো শাস্তি দিতে চান অথবা তোমাদের প্রতি কৃপা করতে চান? আর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কোনো অভিভাবক পাবে না আর কোনো সাহায্যকারীও না। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে ভালোভাবে জানেন যারা জিহাদ করা থেকে বাধাদান করে এবং নিজ ভাইদের বলে, আমাদের কাছে চলে আসো, আর তারা যুদ্ধে খুব কমই অংশ গ্রহণ করে।তোমাদের ব্যাপারে (তারা) ভীষণ কৃপণ। আর যখন ভয়ভীতি দেখা

দেয় তখন তুমি তাদেরকে দেখবে, তারা তোমার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন তাদের চোখ আতঙ্কে ঘূর্ণায়মান থাকে, সেই ব্যক্তির ন্যায় যার ওপর মৃত্যুর মূর্ছা ছেয়ে যায়। অতঃপর যখন ভয় দূর হয়ে যায় তখন তারা নিজেদের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে তোমাদের কষ্ট দেয়, (আর) কল্যাণের ব্যাপারে কৃপণতা করে। এরাই সেসব লোক, যারা সত্যিকার অর্থে ঈমান আনেনি। অতএব আল্লাহ্ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্র পক্ষে এটা অতি সহজ। তারা মনে করে (হানাদার) বাহিনী এখনও ফিরে যায়নি। আর হানাদার বাহিনী যদি ফিরে আসে তাহলে তারাএকান্ত আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায় তারা যদি মরুভূমিতে বেদুঈনদের মাঝে থাকত আর তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতো! আর তোমাদের মাঝে থাকলেও তারা যুদ্ধ খুব কমই করত।নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে, প্রত্যেক সে ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ ও পরকালের (সাক্ষাৎ সম্পর্কে) আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক হারে স্মরণ করে।আর মু'মিনরা যখন (হানাদার) বাহিনীকে দেখতে পেল তখন তারা বললো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এ তো তা-ই। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল সত্য বলেছিলেন। আর এ (ঘটনা) তাদেরকে ঈমান ও আত্মসমর্পণেই আরও উন্নত করেছে।মু'মিনদের মাঝে এমন অনেক পুরুষ রয়েছে যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে।অতএব তাদের মাঝে এমনও (লোক) আছে যে নিজের সংকল্প পূর্ণ করেছে আর তাদের মাঝে এমনও (লোক) আছে যে এখনও অপেক্ষা করছে। আর তারা নিজেদের কর্মপদ্ধতিতে আদৌ কোনো পরিবর্তন করেনি।এর কারণ হলো আল্লাহ্ যেন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতার প্রতিদান দেন এবং চাইলে মুনাফেকদের শাস্তি দেন অথবা তওবা গ্রহণ করে তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল এবং বার বার কৃপাকারী।আর আল্লাহ অস্বীকারকারীদেরকে তাদের ক্রোধসহ এমনভাবে ফিরিয়ে দিলেন যে, তারা কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারেনি। আর যুদ্ধে আল্লাহ্ মু'মিনদের পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমতাবান ও মহা পরাক্রমশালী।

এ হলো পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলোর অনুবাদ।

এই যুদ্ধের নামকরণের কারণ অর্থাৎ এই যুদ্ধের নাম কীভাবে রাখা হয়? এই যুদ্ধকে খন্দক বা পরিখার যুদ্ধও বলা হয়। কেননা, আরবের প্রচলিত প্রথা বহির্ভূতভাবে প্রথমবারের মতো মুসলমানরা পরিখা খনন করে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করেছিল। আর একে আহযাবের যুদ্ধও বলা হয়। পবিত্র কুরআন এ (যুদ্ধ)-কে এই নাম দিয়েছে। আহযাব 'হিযব' (শব্দের) বহুবচন, যার অর্থ সম্প্রদায় ও দল। যেহেতু এই যুদ্ধে আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্র সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেছিল, এজন্য এই যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধ বলা হয়েছে।

এর কারণ বর্ণনা করা হয় যে, চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে ইহুদীদের বনু নযীর গোত্রকে তাদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গা, বিদ্রোহ এবং মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করার কারণে মদীনা থেকে দেশান্তরিত করা হয়। এই অঙ্গীকার ভঙ্গাকারী বিদ্রোহী গোত্রের শাস্তি তো এরচেয়ে অনেক কঠোর ছিল, কিন্তু তাদের আবেদনে মহানবী (সা.) ক্ষমা, মার্জনা ও দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে দেশান্ত র করে দেন। তখন এই গোত্র নিজেদের সকল মালপত্র নিয়ে মদীনা থেকে কিছু দূরে খয়বরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু মাত্র চারমাস অতিক্রান্ত হতেই, অকৃতজ্ঞ ও চক্রান্তকারী (এই) ইহুদীরামহানবী (সা.) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে এমন এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র রচনা করে, যাতে মুসলমানরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ষড়যন্ত্র অনুযায়ী বনু নযীর গোত্রের নেতা হুয়ী বিন আখতাব, যে নিজের অহংকার, দম্ভ এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ক্রোধের কারণে ইহুদীদের আবু জাহল আখ্যায়িত হবার যোগ্য। (সে) নিজের নেতৃস্থানীয় সঙ্গীদের নিয়ে মক্কায় যায় এবং আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে আর তাদেরকে বলে, আমরা তোমাদের সাথে আছি; আমরা মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, যাতে আমরা সবাই মিলে মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে একটি চুক্তি করতে পারি। মূর্তিপূজারী কুরাইশের এর বেশি আর কী চাওয়ার ছিল! তারা তো আগে থেকেই রক্তপিপাসু মনোভাব পোষণ করতো এবং বদর ও উহুদের মতো যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। কিন্তু নিজেদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারে নি। বদরের প্রতিশোধ ও উহুদের অনুশোচনার জ্বালা পুনরায় জেগে উঠে। আবু সুফিয়ান বনু নযীরের নেতাদের স্বাগত জানিয়ে বলে, তোমরা নিজেদের বাড়িতে এসেছ আর সকল মানুষের মধ্যে তোমরা আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর শত্রুতায় আমাদের সাহায্য করে। পারস্পরিক সলাপরামর্শের পর কুরাইশের পঞ্চাশজন এবং এসব ইহুদীরা কা'বা গৃহের পর্দা বা গিলাফ ধরে দৃঢ় অঙ্গীকার করে আর শপথ করে যে, তারা একে অপরকে সহযোগিতা করবে এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে তাদের সবার সিদ্ধান্ত এক হবে। আর আমরা সবাই মিলে মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের নিশ্চিহ্ন করে দিবো। যাহোক, আবু সুফিয়ানের সাথে মদীনায় এক ভয়ংকর আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র এবং (দিন) তারিখ নির্ধারণ করার পর বনু নযীরের এই প্রতিনিধিদল আরবের অন্যান্য গোত্রের কাছে যায়, যারা মুসলমানদের রক্ত পিপাসু ছিল এবং বিভিন্ন ব্যর্থ আক্রমণও রচনা করেছিল। যেমন, সর্বপ্রথম তারা বনু গাতফানের কাছে যায়। এরা আরবে একটি বীর গোত্র হিসেবে গণ্য হতো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্য পরিচিত ছিল। ইহুদীরা তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানায় এবং এর পাশাপাশি খয়বরের এক বছরের খেজুর দেওয়ারও লোভ দেখায়। আর একথাও বলে যে, মক্কার কুরাইশরা আমাদের সাথে আছে। তখন বনু গাতফানও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং নিজেদের পক্ষ থেকে ছয় হাজার সেনার নিশ্চয়তা দেয়। এরপর ইহুদীদের এই দলটি বনু সুলায়েম এর কাছে যায়। এটি অপর একটি গোত্র ছিল, যারা পূর্বে ই মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল। যখন এই গোত্র এত বিশাল সম্মিলিত সেনার আক্রমণের সংবাদ পায় তখন তারাও সানন্দে সাড়া দেয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৬৩-৩৬৪) (গাযওয়ায়ে আহযাব, প্রণেতা- আল্লামা মহম্মদ আহমদ বাশমিল, পৃ: ৬২)

একইভাবে বনু ফুযারা (গোত্র) তাদের নেতা উয়াইনা'র নেতৃত্বে মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য সম্মত হয় এবং উয়াইনা তার মিত্র গোত্র বনু আসাদ গোত্রকে আহ্বান জানায়। তদনুযায়ী বনু আসাদের নেতা তুলায়হা আসদীও এই আহ্বানে সাড়া দেয়। বনু মুররাহ্ এবং বনু আশজা'আ গোত্রও এই যুদ্ধের লোকবল বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা সবাই এমন গোত্র ছিল যাদের বীরত্বের কারণে সমগ্র আরবে সনামধন্য ছিল।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৭০-২৭১)

এর বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশির আহমদ (রা.) লিখেন, মক্কার কুরাইশ এবং নাজদের গোত্র গাতফান ও সুলায়েম যদিও পূর্ব থেকেই মুসলমানদের রক্ত পিপাসু ছিল এবং ভবিষ্যতেও মদীনার বিরুদ্ধে আক্রমন রচনার ফন্দি করছিল, তবে তখনও পর্যন্ত তারা ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের সর্বশক্তি একই ময়দানে প্রয়োগ করে নি। কিন্তু যখন ইহুদী গোত্র বনু নাযিরের সদস্যদের নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং কলহপ্রিয়তার কারণে মদীনা থেকে দেশান্তরিত করা হয়, তবে তাদের নেতৃ বর্গ এই মহৎ বরং অনুগ্রহপরায়ণ আচরণকে ভুলে যায়। তাদের প্রতি মহানবী (সা.) অনেক বড় অনুগ্রহ করেছিলেন। (সেই অনুগ্রহকে) যা মহানবী (সা.) তাদের প্রতি করেছিলেন তা ভুলে গিয়ে পরস্পর (আলোচনা করে) এই প্রস্তাব উপস্থাপন করে যে, আরবের বিক্ষিপ্ত সকল শক্তিকে এক স্থানে সমবেত করে ইসলামকে নিঃশেষ করার চেষ্টা করা হোক। যেহেতু ইহুদীরা খুবই চতুর ও কুটবুদ্ধিসম্পন্ন ছিল আর এধরনের দুরভিসন্ধিতে তারা খুব পটু ছিল তাই তাদের এই নৈরাজ্য ও ফিতনার চেষ্টা সফলতার মুখ দেখে এবং আরবের সকল গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে।ইহুদী নেতৃ বৃন্দের মধ্যে সালাম বিন আবীল হুকায়েক, হুয়াই বিন আখতাব এবং কিনানা বিন রাবী' এই উত্তেজনা বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে অংশ নেয়। কাজেই এই কলহপ্রিয় চরিত্রের অধিকারীরা নিজেদের নতুন দেশ খায়বার থেকে বের হয়ে হিজাজ ও নাজাদের গোত্রগুলোর কাছে যায়। সর্বপ্রথম মক্কায় পৌঁছে তারা কুরাইশদেরকে নিজেদের সাথে একীভূত করে। কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তারা একথা বলতেও দ্বিধা করে নি যে, মুসলমানদের ধর্মের চেয়ে তোমাদের ধর্মের অংশীবাদিতা ও মূর্তিপূজা উত্তম। একথা তারা তাদেরকে বলে। এরপর তারা নাজাদে গিয়ে গাতফান গোত্রকে নিজেদের সাথে মিলিত করে। এবং এই গোত্রের শাখাসমূহ ফুযারা, মুররাহ এবং আশজা প্রভৃতিকে নিজেদের সাথে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে নেয়। এরপর কুরাইশ এবং গাতফানের উস্কানিতে বনু সুলায়েম এবং বনু আসাদও ইসলাম বিরোধী এই জোটের বৃত্তে সংযুক্ত হয়ে যায়। অপরদিকে ইহুদীরা তাদের মিত্র গোত্র বনু সা'দকে বার্তা প্রেরণ করে তাদের সাহায্যার্থে রাজি করায়। এই শক্তিশালী জোট ছাড়াও কুরাইশরা তাদের চতুর্দিকের গোত্রগুলোর মাঝেও বহুসংখ্যক লোক, যারা তাদের অধিনস্ত ছিল তাদেরকে নিজেদের সাথে একীভূত করে নেয়। এরপর পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পর আরব মরু অঞ্চলের এই রক্ত পিপাসু গোত্রগুলো মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে প্রবলবেগে ধাবিত বন্যার ন্যায় মদীনায় এসে উপস্থিত হয় এবং এই সংকল্প করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরে যাব না। ”

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫৭৩-৫৭৪)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, ইহুদীদের দুটি গোত্র, যাদেরকে ঝগড়া-বিবাদ, হত্যা এবং হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কারণে মদীনা থেকে দেশান্তরিত করা হয়েছিল, তাদের মাঝ থেকে বনু নাযির গোত্রের কিছু অংশ সিরিয়ার দিকে হিজরত করে আর কিছু অংশ মদীনার উত্তর দিকে খায়বার নামক শহরের দিকে হিজরত করে। খায়বার আরবে ইহুদীদের অনেক বড় কেন্দ্র ছিল আর এটি দুর্গবেষ্টিত শহর ছিল। সেখানে গিয়ে বনু নযির মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরবদের মাঝে উত্তেজনা ছড়ানো আরম্ভ করে। মক্কাবাসিরা তো পূর্ব থেকেই বিরোধী ছিল আর বাড়তি প্ররোচনার প্রয়োজন ছিল না। অনুরূপভাবে নজদের গোত্র গাতফান, যারা আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে অনন্য মর্যাদা রাখত, তারাও মক্কাবাসির মিত্রতার খাতিরে ইসলামের শত্রুতায় সর্বদা প্রস্তুত থাকত। এখন ইহুদীরা কুরাইশ ও গাতফানকে উত্তেজিত করা ছাড়াও বনু সুলায়েম ও বনু আসাদ- এ উভয় প্রবল শক্তিধর গোত্রকেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকে এবং একইভাবে বনু সা'দ নামক গোত্র যারা ইহুদিদের সাথে চুক্তিবন্ধ ছিল তাদেরকেও মক্কার কাফেরদের সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত করে। এক দীর্ঘ প্রস্তুতির পর আরবের সমস্ত শক্তিশালী গোত্রগুলোর সম্মিলিত ঐক্য রচিত হলো যাদের সাথে মক্কার লোকেরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, মক্কার চারপাশের গোত্রগুলোও ছিল এবং নাজদ ও মদীনার উত্তরাঞ্চলেরএলাকাসমূহের গোত্রগুলো আর ইহুদিরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে মদীনায় আক্রমণের জন্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে।" (দিবাচা তফসীরুল কুরআন, খণ্ড-২০, পৃ: ২৬৭)

কুরাইশ এবং অন্যান্য গোত্রগুলোর এ যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা এবং তাদের সংখ্যা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত এভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, মক্কার কুরাইশরা চার হাজার সৈন্য নিয়ে যাত্রা করে। তাদের নেতৃত্ব প্রদান করছিল আবু সুফিয়ান। অশ্বারোহীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ। তারা দারুন নাদওয়াতে পতাকা বেঁধে নেয় যা কুরাইশদের পরামর্শ সভার স্থান ছিল এবং উসমান বিন তালহা তা বহন করে যিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (তারা) নিজেদের সাথে তিন শত ঘোড়া নেয় এবং তাদের সাথে পনের শত উট ছিল। বনু সুলায়েমের সাত শত লোক কুরাইশদের সাথে এসে মিলিত হয়। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল সুফিয়ান বিন আবদে শাম্‌স। বনু আসাদ তোলায়হা বিন খুওয়ালিদের নেতৃত্বে যাত্রা করে এবং বনু ফাজারা'র এক হাজার লোক বের হয় যাদের নেতৃত্ব উয়াইনা বিন হিস্‌ন প্রদান করছিল। বনু আশজাআ'র চারশত লোক বের হয় এবং তাদের নেতা ছিল মাসউদ বিন রুখায়লা। বনু মাররা'র চার শত লোক যাত্রা করে আর তাদের নেতৃত্ব প্রদান করছিল হারেস বিন অওফ মুররি। বনু গাতফানের পক্ষ থেকে ছয় হাজার সৈন্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছিল এবং ইহুদিদের পক্ষ থেকে দুই হাজারের অধিক রিজার্ভ ফোর্স ছিল যারা এ বিশাল সৈন্যবাহিনীর পেছনে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আর এভাবে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাদের সংখ্যা কমপক্ষে দশ হাজার এবং কতিপয় বর্ণনানুযায়ী চব্বিশ হাজারের কাছাকাছি ছিল। তাদের সকলের নেতৃত্বভার ছিল আবু সুফিয়ান বিন হারবের হাতে যা সে সময় পর্যন্ত আরবের ইতিহাসে সর্বাধিক বৃহৎ সামরিক অভিযান ছিল।

(হায়াতে মহম্মদ, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হায়কেল, পৃ: ৪৩৪) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৬৪) (গাযওয়ায়ে আহযাব, প্রণেতা- আল্লামা মহম্মদ আহমদ বাশমিল, পৃ: ১৫৩) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ২৯৯)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এ সম্পর্কে লিখেছেন, কাফেরদের এত বিশাল সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা দশ হাজার থেকে পনের হাজার পর্যন্ত, বরং কতক বর্ণনানুযায়ী চব্বিশ হাজার পর্য ন্ত ধারণা করা হয়েছে। যদি দশ হাজারের ধারণাকে সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয় তথাপিও সে যুগ অনুযায়ী এ সংখ্যা এত বিশাল ছিল যে, সম্ভবত এর পূর্বে আরবের গোত্রীয় যুদ্ধে এত বড় সংখ্যাক সৈন্য কখনো কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। সমস্ত সৈন্যবাহিনীর মহানায়ক অর্থাৎ সেনাপতি ছিল আবু সুফিয়ান বিন হারব। খাদ্যসামগ্রী এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সবদিক থেকে পর্যাপ্ত ছিল। এভাবে এ সৈন্যবাহিনী পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাস মোতাবেক ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।" (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ:৫৭৪)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ এ সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা দশ হাজার থেকে চব্বিশ হাজার পর্যন্ত ধারণা করেছেন। কিন্তু এটি স্পষ্ট যে, সমস্ত আরবের সম্মিলিত সংখ্যা কেবলমাত্র দশ হাজার সৈন্য হতে পারে না, নিশ্চিতভাবে চব্বিশ হাজারের ধারণা অধিক যথাযথ। আর যদি এতটা নাও হয় তথাপি এ সৈন্য সংখ্যা আঠারো থেকে বিশ হাজার তো অবশ্যই হবে। মদীনা একটি সাধারণ উপশহর ছিল। এ উপশহরের বিরুদ্ধে সমস্ত আরবের আক্রমণ কোন সাধারণ আক্রমণ ছিল না। মদীনার লোকদের সম্মিলিত সংখ্যা যাদের মাঝে বৃদ্ধ-যুবক-শিশুও অন্তর্ভুক্ত ছিল শুধুমাত্র তিন হাজার হতে পারে। এর বিপরীতে শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা বিশ থেকে চব্বিশ হাজারের মাঝামাঝি ছিল আর এছাড়া তারা প্রত্যেকে সেনা সদস্য ছিল। যুবক এবং যুদ্ধ করার যোগ্য ছিল, কেননা শহরে থেকে যখন সুরক্ষার প্রশ্ন আসে তখন এর মাঝে শিশু ও বৃদ্ধরাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। পক্ষান্তরে দূ রদূরান্তে যখন সৈন্যবাহিনী পথ অতিক্রম করে যায় তখন সেখানে কেবল যুবক এবং শক্তিশালী ব্যক্তিরাই হয়ে থাকে। ফলে এটি নিশ্চিত যে, কাফিরদের সৈন্যবাহিনীর মাঝে বিশ হাজার কিংবা পঁচিশ হাজার যত সংখ্যক মানুষই থাকুক তারা সবাই শক্তিশালী, যুবক এবং অভিজ্ঞ সৈন্য ছিল; কিন্তু মদীনার মোট পুরুষের সংখ্যা শিশু এবং প্রতিবন্ধী-সহ সর্বোচ্চ তিন হাজার ছিল। জানা কথা, এসব বিষয়াদি দৃষ্টিপটে রেখে যদি মদীনার সৈন্যসংখ্যা তিন হাজার মনে করা হয় তবে শত্রুদের সংখ্যা চল্লিশ হাজার মনে করতে হবে, কেননা দুই দলের মধ্যে কোনো তুলনাই চলে না। আর শত্রুসেনার সংখ্যা যদি বিশ হাজার মনে করা হয় তবে মদীনার সৈন্যসংখ্যা ধরে নিতে হবে মাত্র দেড় হাজার।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৬৭-২৬৮)

কেননা তাদের মাঝে দুর্বল মানুষও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যাইহোক, কাফিররা যুদ্ধের নিয়তে সামনে অগ্রসর হতে থাকল এবং মহানবী (সা.) এ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে পরিখা খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর বিবরণে লেখা আছে, মহানবী (সা.)-এর গোয়েন্দা বিভাগ তথা ইন্টেলিজেন্সও এসব অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না এবং তারা চারিদিক থেকে মহানবী (সা.)-এর নিকট এসব সংবাদ পৌঁছাচ্ছিলেন। কুরাইশ এবং ইহুদীদের এই ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের সংবাদ মদীনায় পৌঁছালে তিনি (সা.) সাহাবীদের একত্রিত করেন আর তাদেরকে শত্রুদের দুরভিসন্ধির সংবাদ বলেন ও পরামর্শ করেন যে, মদীনার বাইরে গিয়ে প্রতিহত করুন কিংবা সেখানে থেকে তাদের সাথে যুদ্ধ করুন। একটি অনেক বড়ো সেনাবাহিনী এবং তাদের এ বৃহৎ সংখ্যার কারণে অধিকাংশ মতামত আসে যে, মদীনার ভেতরে থেকে প্রতিহত করাই অধিক সমীচীন হবে। রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত সালমান (রা.)-এর পরামর্শের উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনি পরিখা খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! পারস্যে আমরা যখন ঘোড়া-বহরের ভয় পেতাম তখন তাদের সামনে পরিখা খনন করতাম অর্থাৎ ঘোড়াবাহিনী যখন আসত তখন গর্ত খোদাই করতাম যার ফলে তারা সেগুলো অতিক্রম করার সামর্থ্য রাখত না। এই মতামত সবার কাছে ভালো লাগে এবং মহানবী (সা.) মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থান করে প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং পরিখা খননের নির্দেশ প্রদান করেন।

কিছু জীবনীগ্রন্থ থেকে বুঝা যায়, পরিখা খননের সিদ্ধান্ত কেবল হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শ অনুযায়ী হয় নি বরং আল্লাহ্ তা'লা ইলহামের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে এ পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন, কেননা আরবের জন্য এ পদ্ধতি একেবারেই নতুন ছিল। তারা প্রতিরক্ষামূলক পরিখা খননরীতি সম্বন্ধে মোটেও অবহিত ছিল না। অতঃপর লেখা আছে, আবু সুফিয়ান যখন শক্তিমত্তার নেশায় বুঁদ এক সাহসী সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনাভিমুখে আক্রমণের লক্ষ্যে রওয়ানা হয় তখন মদীনাবাসীর পক্ষ থেকে কোথাও কোনো বাধা তার দৃষ্টিতে পড়ল না এবং কোনো ইসলামী সৈন্যবাহিনী সে দেখল না। এর ফলে প্রথমত নিজেদের বিশাল সৈন্যবাহিনীর কারণে তার মাঝে তো এ অহংকার ছিল যে, মদীনাবাসীকে তাদের হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। সে বলে, এখন তো আমি মদীনাকে ধ্বংস করেই যাব আর মদীনা পর্য ন্ত পুরো রাস্তায় যখন কোনো প্রতিরক্ষামূলক বাধা চোখে পড়ল না তখন তার ক্রোধ ও অহংকার আরো বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যখন তারা ঘোড়া বাগিয়ে মদীনার নিকটে পৌঁছায় তখন হঠাৎ নিজেদের সামনে পাঁচ কিলোমিটার লম্বা, আট-নয় ফুট গভীর ও প্রশস্ত গর্ত দেখে তার পিলে চমকে যায়। এই পরিখাসমূহ এতই গভীর

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁহযরত (সা.) বলেন- 'আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট 'লাওহে মাহফুয' এ সেই সময় খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছি যখন আদম সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

ও প্রশস্ত ছিল যে, ঘোড়া বাগিয়েও তা পার হওয়া অসম্ভব ছিল। সুতরাং এরা যখন এসব পরিখা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হলো তখন নিজের প্রচণ্ড রাগ, হতাশা, অহংকার এবং ক্রোধমিশ্রিত আবেগের বশে এখান থেকে মহানবী (সা.)-এর নিকট একটি চিঠি লেখে যেখানে সে লিখেছে, লাত, উযযা, আস্‌সাফ, নায়লা ও হুবলের কসম! আমি এ লক্ষ্যে এসেছিলাম যে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরত যাব না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নামচিহ্ন মিটিয়ে দেবো কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছু হটছ এবং নিজেদের চারিদিকে গর্ত করে রেখেছ। হায়, যদি আমি জানতাম এ পদ্ধতি তোমাদের কে শিখিয়েছে! আর যদি আমরা ফেরতও যাই তবে মনে রেখো! তোমাদের পুনরায় উহুদের যুদ্ধের দিন স্মরণ করাবো যেখানে এবার তোমাদের মহিলাদেরকেও জবাই করা হবে। এ চিঠি সে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করেছিল।

এর উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আবু সুফিয়ানকে চিঠি লিখেন ও বলেন, তোমার চিঠি পেয়েছি। আমি জানি, তুমি সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে অহংকারে মত্ত আর তুমি মদীনাতে নিজ সৈন্যবহর নিয়ে এরূপ আক্রমণ করার কথা উল্লেখ করেছ যেখানে তুমি আমাদের নামচিহ্ন মিটিয়ে দেওয়ার সংকল্প করেছ। এটি তো আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ যা তোমার অপবিত্র সংকল্পসমূহের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, তোমরা সে সুযোগ পাও নি। এরপর তিনি (সা.) লেখেন, আর তিনি এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যে, তোমরা লাত ও উযযার নাম পর্যন্ত ভুলে যাবে এবং যেভাবে তোমাদের এ জিজ্ঞাসা, গর্ত করতে আমাকে কে শিখিয়েছে? তো (এর উত্তর হচ্ছে) ফাইন্ন ল্লাহা আলহামানি যালিকা। এ পদ্ধতি আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইলহামের মাধ্যমে শিখিয়েছেন। তোমাদের ও তোমাদের সঙ্গীসাথিদের ক্রোধ-রাগ যখন বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এটি বলেছেন। এরপর তিনি (সা.) লেখেন, আর শোনো! পরিণতি দানকারী আল্লাহ্ আমাদের সফলতা দান করবেন এবং হে বনু গালেবের নির্বোধরা! স্মরণ রেখো, এমন দিন সন্নিকট যেদিন তোমাদের লাত, উযযা, আসসাফ, নায়লা ও হুবলকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আর সেদিন আমি তোমাদের এসব স্মরণ করাবো।

(সুবুলুল হুদা ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৪) (খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা- আবু যোহরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৪২) [আসসহীহ মিন সীরাতুন নবী আল আযাম (সা.), ১০ম খণ্ড, পৃ:১৯৭]

অতএব সুস্পষ্টভাবে তাকে লিখেছেন, বিজয় আমাদেরই হবে, ইনশাআল্লাহ্। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ চিঠি থেকে এটি সুস্পষ্ট হয়, যদিওবা হযরত সালমান ফার্সি তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কিন্তু এ কাজকে বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্ত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ইলহামের মাধ্যমেই জানানো হয়েছিল। ওয়াল্লাহু আ'লামু (আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন)। মোটকথা, তাঁর সিদ্ধান্তও ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এ সম্পর্কে অবগত করেন। অবশিষ্টাংশ ভবিষ্যতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

বর্তমান সময়ে পাকিস্তানের আহমদীদেরকে দোয়ায় বিশেষভাবে স্মরণ রাখুন। পাকিস্তানি আহমদী সদস্যরা নিজেরাও দোয়া ও সদকা করার প্রতি মনোযোগী হোন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের রক্ষা করুন ও বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন আর কুচক্রান্ত কারীদের চক্রান্ত তাদের ওপরই বর্তাক। সার্বিকভাবে বিশ্বে র উন্নতির জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সারা বিশ্বকেও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

১২৯ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৪ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহতা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

(২পাতার পর......)

মসীহ মওউদ (আ.) নবী হওয়ারও দাবী করেছেন। তবলীগাধীন মেয়েদেরকে বলুন যে, তিনি কি ধরণের নবুয়তের দাবী করেছেন।

মিটিংয়ের শেষে সদর লাজনা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে মসজিদে মেয়েদের জন্য জায়গার অভাবের কথা জানান। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আপনি বিষয়টি লিখিত আকারে দিন। তিনি (আই.) বলেন সদর লাজনা যেন আমার কাছে সরাসরি নিজেদের রিপোর্ট পাঠায়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অঙ্গ সংগঠনগুলি এজন্য তৈরী হয়েছে যেন জামাত গতিশীল থাকে এবং উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকে। চারটি চাকাই গতিশীল থাকলে উন্নতি থেমে থাকবে না। যদি চারটি বিভাগ জামাতি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে লাজনা, আনসার ও খুদ্দাম সহ সক্রিয় হয়ে ওঠে তবে উন্নতির গতি অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

বায়তুল আফিয়াত মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

আজ প্রোগ্রাম অনুযায়ী ওয়ালডশাট টিনজেন শহরে মসজিদ বায়তুল আফিয়াতের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল। হুযুর আনোয়ার দশটা ৪০ মিনিটে বিশ্রামক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে ইজতেমায়ী দোয়া করান। এরপর হুযুরের সফরদলটি রওনা দেয়। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ওয়াল্ড শাট শহরের দূরত্ব ৩৭০ কিলোমিটার। প্রায় ৪ ঘন্টা ২০ মিনিট সফরের পর হুযুর আনোয়ার বার্চারে আসেন। পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠান অনুযায়ী মসজিদে উদ্বোধনের কারণে এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সওয়া চারটের সময় হুযুর বায়তুল আফিয়াতের জন্য রওনা হন। পাঁচ মিনিটের সফর করে তিনি মসজিদ বায়তুল আফিয়াতে পৌঁছে যান।

স্থানীয় জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হুযুরের আগমণের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে নিজেদের প্রস্তুতিতে মগ্ন ছিল। হুযুর আনোয়ার এই প্রথম তাদের শহরে পদার্পণ করতে চলেছেন। তাদের জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত আনন্দের। প্রত্যেকেই উৎফুল্ল বদনে পুলকিত নয়নে হুযুরের পথ চেয়ে ছিল। আজ আশেপাশের জামাতের মানুষও সমবেত হয়েছে। হুযুর আনোয়ার গাড়ি থেকে নেমে আসা মাত্রই জামাতের সদস্যগণ পরম উদ্দীপ্ত কণ্ঠে নিজেদের প্রিয় ইমামকে অভিবাদন ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে থাকল। কচিকাচাদের বিভিন্ন গ্রুপ অভিবাদন গীত উপস্থাপন করল। ছোট বড় প্রত্যেকে হাত নাড়িয়ে হুযুরকে স্বাগত জানাচ্ছিলেন। মহিলারাও নিজেদের প্রিয় ইমামকে চাক্ষুস দর্শন করে ধন্য হচ্ছিল। একজন তিফল (বালক) মামুন আখতার হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে ফুলের তোড়া উপস্থাপন করে।

সদর জামাত ইমরান বাশারত সাহেব, রিজিওনাল আমীর নাসীর বার্মী সাহেব এবং এই অঞ্চলের মুবাল্লিগ সিলসিলা শাকীল আহমদ সাহেব উমর হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে স্বাগত জানান এবং করমর্দন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট হলঘরের দিকে আসেন এবং যোহর ও আসরের নামায পড়ান। এরপর মসজিদের উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। নামাযের পর হুযুর আনোয়ার কিছুক্ষণের জন্য মসজিদে উপবিষ্ট থাকেন। সেই সময় স্থানীয় জামাতের সকল সদস্য হুযুরের সঙ্গে করমর্দন করেন। হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে সদর জামাত বলেন, এই জামাতের জনসংখ্যা ১২১ জন। আজকে মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আশেপাশের জামাত থেকেও মানুষ এসেছেন। সুইজারল্যান্ডের সীমা এখান থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে। সুইজার ল্যান্ড থেকে আমীর সাহেব এবং অন্যান্য কিছু সদস্য মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) মহিলাদের হলঘরে আসেন। বালিকাদের গ্রুপ দোয়া সংবলিত নযম উপস্থাপন করে। মহিলারা হুযুরের যিয়ারত করেন। হুযুর বাচ্চাদেরকে স্নেহভরে চকলেট উপহার দেন। এরপর হুযুর আনোয়ার মসজিদের বাইরের অংশে এসে একটি চারাবৃক্ষ রোপন করেন। প্রাদেশিক টিভি চ্যানেল এস.ডবলিউ.আর ফ্রেইবার্গ এর এক মহিলা সাংবাদিক মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন। ভদ্রমহিলা হুযুরের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এটি একটি ছোট শহর, এখানে আপনার মসজিদ নির্মাণের পেছনে উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন- ইবাদত করার জন্য আহমদীদের এখানে একটি জায়গার প্রয়োজন ছিল, যেরূপ ইহুদীদের 'সীনাগগ' হয়ে থাকে। খৃষ্টানদের গির্জাঘর হয়ে থাকে। প্রত্যেক ধর্মের নিজের নিজের উপাসনাগার থাকে। আমাদের ইবাদতের জন্য একটি মসজিদের

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

যুক্তরাজ্যের জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণের সারাংশ

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ,তিনি আমাদেরকে এ যুগের ইমামকে মান্য করার সৌভাগ্য দিয়েছেন।মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখার সৌভাগ্য দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। আর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ইবাদাতের মাধ্যমে করা উচিত। মহানবী (সা)-এর যুগে মহিলা সাহাবীরা পুরুষদের তুলনায় অধিক ইবাদাত করার চেষ্টা করতেন। এ যুগেও এমন মহিলা আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগেও দান করেছেন। হযরত আম্মা জান মোহতরমা নুসরাত জাহাঁ বেগম সাহেবা এমনই এক মহিলা। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ এক মহান সন্তান দান করেছেন। হযরত আম্মাজানের কিছু বিষয় বলতে চাই। এক মহিলা বলেন, আমরা যখন আম্মাজানের সাথে দেখা করতে যেতাম তখন জ্ঞানের কথা বলতাম। মানুষকে নিয়ে বাজে আলাপ করতাম না। একদা নামাযের সময় হলে আম্মাজান সবাইকে বললেন, নামায পড়ে নাও, এ কথা বলে ঘরের অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং নামায আদায় করে এসে বললেন, তোমরা কি নামায পড়েছ? এক মহিলা বলেন, আমার কোলে ছোট শিশু ছিল এবং শিশু সন্তানের প্রস্রাবের কারণে কাপড় ভিজা ছিল। আমি বললাম, সম্ভবত আমার কাপড় অপবিত্র। তাই আমি ঘরে গিয়ে নামায পড়ে নিব। একথা শুনে হযরত আম্মাজান খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, বাচ্চার দোষ দিয়ে বাহানা করা ঠিক না। সন্তান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পুরস্কার হয়ে থাকে। তাই সন্তানকে আল্লাহ্র ইবাদাতের মাঝে অন্তরায় বানিও না। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্ট হবেন।

অতএব এ ধরনের মায়েদের সাবধান হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা অমুখাপেক্ষী। যখন আল্লাহ্ দেখবেন, এই সন্তান আমার ইবাদাত থেকে তাকে বাধা দিচ্ছে, তখন সেই বাচ্চাকে আল্লাহ্ নিয়ে যেতে পারেন।

আল্লাহ্ বলেন, তোমরা স্বামী-স্ত্রী আল্লাহ্র কাছে সুস্থ সন্তানের জন্য দোয়া করে থাক। আর আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে সন্তান দেন, তখন তোমরাশিরক করতে শুরু করো। শৈশব কাল থেকেই বাচ্চার সামনে পিতামাতা উত্তম আদর্শ দেখালে বাচ্চা নষ্ট হয় না। অনেক সন্তান জিজ্ঞেস করে, আমরা কেন আল্লাহ্র ইবাদাত করব? তাদেরকে বলা উচিত, আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমাদের ইবাদাত করা উচিত। অনেক মায়েরা টিভি চ্যানেলের সামনে বসে বিভিন্ন সিরিয়াল দেখার পেছনে সময় ব্যয় করে, অর্থ উপার্জনের দিকে মনোযোগী থাকে ফলে সন্তান বিপথগামী হয়ে যায়। তাই সন্তানের অধিকার প্রদান করাও আবশ্যক। বাচ্চাদের জন্য দোয়া করা আবশ্যক। নিজেদের নামাযের সুরক্ষা করা আবশ্যক। অন্যথায় আহমদী হয়ে কোন লাভ নেই।

এছাড়া সন্তানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা দরকার যেন সন্তান সব কথা পিতামাতার সাথে বলে। বাচ্চাদের কথা শোনা আবশ্যক। অনেক স্বামী-স্ত্রী জাগতিকতা লাভ করার জন্য আল্লাহকে ভুলে যায়। সন্তানের অধিকার আদায় করা ভুলে যায়। অথচ এটি উভয়ের দায়িত্ব। সন্তান নষ্ট হলে তখন বিবেক জাগ্রত হয়, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। অতএব এদিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। তাদেরকে ধর্মীয় পরিবেশে বড় করা আবশ্যক।অনেক মায়েরা অভিযোগ করে বলেন, ১৩/১৪ বছর পর্যন্ত সন্তান জামা'তের সাথে থাকে, তারপর যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন তারা জামা'ত থেকে দূরে সরে যায়। উন্নত বিশ্বে এই দৃশ্য সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। পিতামাতার উচিত, পূর্ব থেকে সন্তানের তরবিয়ত করা, নিজেদের আদর্শ উপস্থান করা। ঘরের পরিবেশ পবিত্র থাকা উচিত।

পশ্চিমা বিশ্বে এখন এমন অনেক কিছু শেখানো হয় যেগুলোকে এখানে সভ্যতা বা স্বাধীনতা বলা হয় অথচ এ কারণে বিশেষকরে এই গরমে দেখবেন ছেলে-মেয়ে খুব সামান্য পোষাক পরিধান করে। এটি নাকি সভ্যতা। এ তো সভ্যতা নয় বরং অসভ্যতা। এরাই যখন অনুন্নত দেশের মানুষকে স্বল্পবসনে দেখে তখন বলে, তারা নাকি জংলি বা অসভ্য। এই একই কাজ যখন এখানের লোকেরা করে, তখন এটি নাকি সভ্যতা!ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই অসভ্যতা আমাদের ঘরেও ঢুকে যাচ্ছে। এটি দাজ্জালের ফিতনা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, প্রত্যেক অঙ্গাকে জেনা থেকে রক্ষা করো।এ যুগের আবিষ্কার মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের জন্য নির্ধারিত ছিল যেন, এর মাধ্যমে ধর্মের প্রচার করা যায়। অথচ এগুলো এখন মানুষের ধ্বংসের কারণ হচ্ছে। বর্তমানে যোগাযোগ মাধ্যম সৃষ্টি হয়েছে। কোন না কোনভাবে মেয়েদের ফোন নম্বর অন্যদের হাতে চলে যায় আর অবশেষে এমন ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি হয় যেখান থেকে ফেরার পথ থাকে না।

হুযুর (আই.) বলেন, আমি পোষাক নিয়ে কথা বলছিলাম। নগ্নতা বলতে কী বুঝায়- তা মানুষ ভুলে যাচ্ছে। মা-বাপ বলে, কোন সমস্যা নেই, বাচ্চা মানুষ, ফ্যাশানের শখ আছে, করুক, কী সমস্যা? আমার কথা হল, ফ্যাশান করতে সমস্যা নেই, কিন্তু ফ্যাশানের নামে যখন নগ্নতার দিকে মেয়ে ধাবিত হচ্ছে সেখানে অবশ্যই বাধা দেওয়া উচিত। অনেক সময় বোরকার নামে যে কোট পরিধান করা হয়, তা এতোই আঁটোসাঁটো হয় যে, পুরুষের সামনে যাওয়ার অবস্থাই থাকে না। তাই বোরকা বা কোট ঢিলাঢালা হওয়া আবশ্যক। অতএব নিজেদের সম্মান এবং পর্দার প্রতি দৃষ্টি রাখুন।

এছাড়া মহিলাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা আদেশ দিয়ে বলেছেন, পরপুরুষের সাথে নরম সুরে কথা বলবে না। মেয়েরা এক বয়স পর যখন অন্যের ঘরে যায় তখন যেন মাহরাম সাথে নিয়ে যায়। প্রত্যেক মেয়েকে নিজের সতীত্ব রক্ষা করা আবশ্যক। মায়েরা মেয়েদেরকে উপদেশ দিয়ে বলবে, তোমার সম্মান, তোমার পরিবারের সম্মান, তোমার জামা'তের সম্মান রক্ষা করে চলবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বয়আতের শর্ত অনুযায়ী জীবন যাপনের সৌভাগ্য দিন।

****

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ-নির্দেশনা।

"আমি বারবার পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি, সন্তানরা বাইরে কেমন পরিবেশে ওঠা-বসা করে তার প্রতিও দৃষ্টি রাখুন আর ঘরে যখন তারা টিভির প্রোগ্রাম দেখে বা ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করে তখনো সজাগ দৃষ্টি রাখুন।"

(খুতবা জুমআ, ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩,বায়তুল ফুতুহ, লন্ডন)

শেষের পাতার পর...

জামাতকে ধন্যবাদ জানাই যে, আপনারা আমাদের জন্য নিজেদের দরজা খোলা রেখেছেন এবং আপনাদের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। কেননা এখানে একাধিক ধর্ম আছে, এবং একে অপরকে খোলাখুলিভাবে নিজেদের ধর্মের শিক্ষা সম্পর্কে বলা আবশ্যক। আমি এবিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি যে, সমস্ত ধর্মের মানুষ যেন পরস্পর শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে। আমার বাসনা জামাত আহমদীয়া যেন উন্নতি লাভ করে। যেভাবে আপনারা সহযোগিতা করেছেন এবং সুসম্পর্ক রেখেছেন ভবিষ্যতেও এমন সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক থাকবে। মসজিদের উপর লিখিত আপনাদের কলেমা সম্পর্কে শহরের মানুষের মনে কিছু ভীতি ও সংশয় ছিল। আপনাকে ধন্যবাদ এই জন্য যে, আপনি নিজেই সে সংশয় দূর করেছেন এবং আপনি বলেছেন যে এই পৃথিবীর স্রষ্টা একজনই । যিনি সকলের স্রষ্টা। আমি ক্ষমাপ্রার্থী যে আমার মনে এমন ভীতি ও সংশয় তৈরী হয়েছিল। পরিশেষে ভদ্রমহিলা বলেন, আমার বাসনা আপনাদের মসজিদ সব সময় আবাদ থাকুক এবং এখানে যেন অনেক মানুষ আসে।

হুযুর আনোয়ার বলেন:তাদের পিতামাতার তাদেরকে ওয়াকফ করা উচিত ছিল। যারা করেছে, তাদের উদ্দেশ্য হলা সন্তানরা যেন ধর্মের সেবা করতে পারে। তারা ওয়াকফ করেছে যাতে সন্তানরা বড় হয়ে জ্ঞানার্জন করে ধর্মের সেবা করে- কেউ ডাক্তার হয়ে সেবা করতে পারে, কেউ শিক্ষক হিসেবে সেবা করতে পারে, কেউ ভাষা শেখানোর মাধ্যমে। এখন নিজেকে ওয়াকফ করে ধর্মের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেও সে ওয়াকফ হবে। আল্লাহ্ তা'লা কোথাও একথা লিখে রাখেন নি যে যারা ওয়াকফে নও-এ আছে কেবল তাদের ওয়াকফই গ্রহণ করবেন। পৃথিবীতে অনেকে আছেন যারা ধর্মের সেবা করছেন, তারা তো ওয়াকফ নও নন। আমাদের যুগে ওয়াকফে নও-এর কোনও স্কীম ছিল না, কিন্তু আমরাও তো ওয়াকফ ছিলাম।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি তোমরা ওয়াকফে নও-এর উপাধি গ্রহণ কর আর নিয়মিত নামায না পড়, কুরআন শরীফ না পড়, ধর্ম সেবার প্রেরণা না থাকে আর নিজেকে ওয়াকফে নও হওয়ার দাবি কর তবে তা কোন উপকারে আসবে না। এটি তোমাদের কোনও ওয়াকফই নয়। আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। অপর দিকে অন্য একটি মেয়ে আছে যে ওয়াকফে নও নয়, কিন্ত সে নামায পড়ে, কুরআন পড়ে, ধর্মের জ্ঞানও অর্জন করে, ধর্ম সেবাও করে- এমন মেয়ে ওয়াকফে নও -এর থেকে উত্তম।

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যে সকল যুদ্ধ হয়েছিল সেগুলি সবই খাঁটি ধর্মীয় যুদ্ধ ছিল যা ধর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ছিল।

ইসলামী শিক্ষা মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সমস্ত মানুষের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং সকলের জন্য স্বাধীনতার নীতিকে সমর্থন করে।

লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে ত্রয়োদশতম বাৎসরিক শান্তি সম্মেলনে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনার অধীনে ১৯ শে মার্চ, ২০১৬ তারিখে লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে ত্রয়োদশতম বাৎসরিক শান্তি সম্মেলনের আয়োজন হয়। এই অনুষ্ঠানে সেক্রেটারী অব্ স্টেট, মেম্বার অব্ পার্লামেন্ট, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীবর্গ, ত্রিশটির অধিক দেশের প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ, সরকারি অধিকারি, মেয়র, বিভিন্ন ধর্ম সংস্থার কর্ণধার এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত আহমদী ও অ-আহমদী মুসলমান পুরুষ ও মহিলারা অংশ গ্রহণ করেন। মসজিদে আগত অতিথিবর্গ রেজিস্ট্রেশনের পর তাঁরা কনফারেন্স হলে একত্রিত হন, এরই মাঝে কিছু অতিথিদেরকে মসজিদ বায়তুল ফুতুহ-র বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করানো হয়।

প্রোগ্রামের শেষে হুযুর আনোয়ার ডাইসে আসেন এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম এবং এর ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করে সভাপতির ভাষণ আরম্ভ করেন।

হুযুর আনোয়ার উপস্থিত অতিথিবর্গকে আসসালামো আলাইকুম-জানান এবং সমস্ত তাদেরকে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনাদের এখানে এসে এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করা বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে কেননা, বর্তমানে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইসলামের নামে অত্যন্ত দুঃখজনক কর্ম করে ইসলামের সুন্দর শিক্ষাকে বদনাম করছে। হুযুর আনোয়ার নভেম্বর মাসে প্যারিস শহরে হওয়া আক্রমণ এবং বিভিন্ন দেশে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বলেন যে, যুক্তরাজ্যে এসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার সম্প্রতি একটি বয়ানে সতর্কবাতা দিয়েছেন যে, সন্ত্রাসী গোষ্ঠী 'দাঈশ' এখানে ভয়াবহ হামলার ষড়যন্ত্র রচনা করছিল এবং তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং সামূহিক ক্ষেত্রগুলি।

হুযুর বলেন, বিগতবছরে ইউরোপে সহসাই বিরাট সংখ্যক শরণার্থী উপস্থিত হয়েছে। যারফলে এখানকার অনেক বাসিন্দা হতাশা, ভয় ও সংশয়ের অনুভূতি নিয়ে কালপাত করছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আপনাদের মধ্য থেকে অমুসলিমদের অংশ গ্রহণ করা প্রমাণ করে যে, আপনারা সাহসী, সহিষ্ণু এবং উন্মুক্ত মনা।

হুযুর বলেন, ঘোর বাস্তব এই যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে কারোর আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিছু মানুষ আছে যারা ইসলামকে উগ্রতাপ্রিয় ধর্ম মনে করে এবং ধারণা করে যে, ইসলাম আত্মঘাতী হামলা বা সন্ত্রাসপূর্ণ কার্যকলাপের অনুমতি দেয়। কিন্তু ,প্রকৃতপক্ষে এর কোন সত্যতা নেই। সম্প্রতি একজন প্রখ্যাত সংবাদ লেখক একটি পত্রিকায় ইসলামোফোবিয়া (ইসলামাতঙ্ক) -এর ক্রমবর্ধমান প্রবণতা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি লেখেন যে, আত্মঘাতী হামলার বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণার পর তিনি জানতে পেরেছেন যে, প্রথম আত্মঘাতী হামলা হয় ১৯৮০-এর দশকে। অথচ ইসলামের সূচনা হয়েছে ১৩০০ বছর পূর্বে এবং ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে না। হুযুর বলেন, তাঁর দলিল খুবই যুক্তিপূর্ণ এবং তিনি সেটি যথাযথভাবেই উপস্থাপন করেছেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, আত্মঘাতী হামলা বর্তমান যুগের উদ্ভাবন এবং এর সঙ্গে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার কোন দুরতম সম্পর্কও নেই। ইসলাম সকল প্রকারে আত্মহত্যা থেকে স্পষ্টরূপে নিষেধ করে। এই কারণে কোন প্রকারের আত্মঘাতী হামলা বা সন্ত্রাসী হামলার অনুমতি দিতে পারে না। এই ধরনের আক্রমণের ফলে নিরীহ শিশু, মহিলা এবং নিরস্ত্র নির্বিশেষে সকলকে অত্যন্ত অত্যাচারপূর্ণভাবে হত্যা করা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সম্প্রতি টেক্সাসের রাইস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডক্টর কনসিডিন ক্রেগ তাঁর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন যে, তথা-কথিত ইসলামিক স্টেট (দাঈশ) -এর পক্ষ থেকে খ্রীষ্টানদের উপর যে অত্যাচার করা হচ্ছে নবী করীম (সা.)-এর কোন নির্দেশ বা লেখনী থেকে তার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। তিনি এও লেখেন যে, মহানবী (সা.) ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার যে চিত্রাঙ্কন করেছিলেন তার ভিত্তি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতএব এটি পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, এই সমস্ত উগ্রবাদী গতিবিধি ইসলামি নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলাম যদি কখনো যুদ্ধের অনুমতি দিয়েও থাকে তবে সেটি আত্মরক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং সেটিও এমন পরিস্থিতিতে যখন তাঁর উপর জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ কুরআন শরীফের সুরা হজ্জ-এর ৪০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন যে, "যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে তাহাদিগকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হইল, কারণ তাহাদের উপর যুলুম করা হইতেছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যে সকল যুদ্ধ হয়েছিল সেগুলি সবই খাঁটি ধর্মীয় যুদ্ধ ছিল যা ধর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ছিল। সুতরাং, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই উদ্দেশ্যে সংঘটিত যুদ্ধগুলিতে শত্রুরা অস্ত্রসজ্জায় সুসজ্জিত ছিল এবং সংখ্যার বিচারে মুসলমানদের তুলনায় কয়েকগুণ ছিল, কিন্তু মুসলমানরা সংখ্যায় কম এবং সম্পূর্ণভাবে অস্ত্রসজ্জিত না হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'লা তাদেরকে জয়যুক্ত করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, একজন মুসলমান হিসেবে যদি আজকের যুগের মুসলমানদের পক্ষ থেকে হওয়া যুদ্ধগুলির বিশ্লেষণ করি তবে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি যে, এগুলি ধর্মীয় যুদ্ধ নয়। এর অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি কারণ হল এই যুদ্ধগুলির অধিকাংশই দেশের আভ্যন্তরীন দ্বন্দের কারণে হয়েছে কিম্বা প্রতিবেশী মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে হয়েছে। এবং যে সমস্ত যুদ্ধগুলি অ-মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে করা হয়েছে সেগুলিকেও ধর্মীয় যুদ্ধ রূপে গণ্য করা হয় নি। এবং দুই পক্ষ থেকেই মুসলমান সেনা যুদ্ধ করেছে। এটি স্পষ্ট থাকা উচিত যে, বর্তমানের যুদ্ধগুলি ইসলামিক বা কোন ধর্মীয় যুদ্ধ নয় বরং এগুলি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে হচ্ছে এবং ইসলামের সুনাম হানির কারণ হচ্ছে।

হুযুর বলেন, এতক্ষন যা কিছু আমি বললাম তার থেকে আপনাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে, সত্য এবং প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে কোন রকম ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। ইসলাম, উগ্রবাদ, আত্মঘাতী হামলা এবং নির্বিচারে হত্যালীলার কোন ক্রমেই অনুমতি দেয় না। ইসলামোফোবিয়ার কোন বৈধতা নেই, কেননা, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা শান্তি প্রতিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা এবং পরস্পরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রতিই উদ্বুদ্ধ করে।

ইসলামী শিক্ষা মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সমস্ত মানুষের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং সকলের জন্য স্বাধীনতার নীতিকে সমর্থন করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আরও একটি বিষয় রয়েছে যা একজন মুসলমান হিসেবে আমাকে যুদ্ধের প্রতি আসক্ত হওয়ার পরিবর্তে সমস্ত মানুষকে ভালবাসতে বাধ্য করে এবং সেটি হল কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'লা প্রারম্ভিক সুরার দ্বিতীয় আয়াতে নিজেকে 'সমস্ত জগতের প্রভু-প্রতিপালক' ঘোষণা করেন।

অতএব, আল্লাহ তা'লা যদি নিজেকে সমস্ত মানুষের প্রভু-প্রতিপালক বলেন এবং অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়, তবে এটি কিভাবে সম্ভব যে, ঈমান আনয়নকারীদের আদেশ দিবেন তাঁরই সৃষ্টির একাংশকে অন্যায়পূর্ণভাবে হত্যা করতে এবং বা যে কোন প্রকারে কষ্টে নিপতিত করতে? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই এটিই হবে যে, এমন আদেশ আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে হতে পারে না।

হুযুর বলেন, এর বিপরীতে এটি সম্পূর্ণ সত্য যে, আল্লাহ তা'লা অত্যাচার, অমানবীয় আচরণ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার আদেশ দিয়ে রেখেছেন। ইসলামী শিক্ষানুযায়ী একজন মুসলমানকে একজন অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করার, যাবতীয় প্রকারের অন্যায়-অত্যাচারকে সমাজ থেকে দূর করার চেষ্টা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলামী শিক্ষানুযায় এই কাজটি দুইভাবে করা যায়। এক, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং আলোচনার মাধ্যমে

সমস্যার সমাধান বের করা। এটি পছন্দনীয় পন্থা। কিন্তু যদি এমনটি সম্ভব না হয় তবে দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়কে প্রতিহত কর যাতে সমাজে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ধর্মের গন্ডীর বাইরেও কিছু বিধি-নিয়ম থাকে যেগুলি উল্লঙ্ঘনকারীদের কে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে। যদি শাস্তি ছাড়াই সংশোধন সম্ভব হয় বা সামান্য শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সংশোধন সম্ভব হয় তবে সেটি সর্বোত্তম উপায়। কিন্তু যদি সংশোধনের জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে তবে সমাজের মঙ্গলার্থে এবং নিদর্শনমূলকভাবে সেই শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে। এখন যদি বিষয়টিকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে, ইসলামী শিক্ষায় অপরাধের শাস্তি কেবল প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে কিম্বা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় না । বরং এর উদ্দেশ্য হল অন্যায়ের অবসান চাওয়া এবং ইতিবাচক পন্থায় মানুষের সংশোধন করা। কুরআন করীম অনুসারে ক্ষমা করলে বা দয়া প্রদর্শিত হয়ে যদি কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের সংশোধন সম্ভব হয় তবে এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু ক্ষমা প্রদানের দ্বারা যদি সংশোধনের উদ্দেশ্য সাধিত না হয় তবে সমাজের সংশোধনের এবং কল্যাণার্থে শাস্তি বহাল হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই কারণে ইসলামে শাস্তির অবধারণা এক অনন্য এবং দূরদর্শী চিন্তাধারাকে লালন করে, কেননা, এর উদ্দেশ্য হল সমাজের মঙ্গলার্থে মানুষকে প্রশিক্ষিত করে তোলা এবং সমাজে উচ্চ মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করা যাতে মানুষ নিজেদের সৃষ্টিকর্তা গুণবলীকে নিজেদের সত্তায় ধারণ করার মাধ্যমে একে অপরের প্রতি যত্নবান হয়। এই কারণে ইসলাম কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের অধিকার আত্মসাত হলে আত্মসাতকারীকে তার অপরাধের স্বরূপ অনুসারে শাস্তি প্রদানের আদেশ দেয়। কিন্তু পক্ষান্তরে, যদি শাস্তি প্রদান ব্যতিরেকে সমাজের সংশোধন সম্ভব হয় তবে এই পন্থাটিকে সর্বোত্তম বলে পরিগণিত করা হয়েছে। এই কারণেই আল্লাহ তা'লা কুরআন মজীদের সুরা নূরের ২৩ নম্বর আয়াতে বলেন, 'তাহারা যেন ক্ষমা করে এবং মার্জনা করে। তোমরা কি চাহনা যে, আল্লাহ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

অনুরূপভাবে সুরা আলে ইমরানের ১৩৫ নম্বর আয়াতে তিনি বলেন, 'যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি মার্জনাশীল, বস্তুতঃ আল্লাহ্ ভালবাসেন সৎকর্মশীলগণকে।' এছাড়াও কুরআন মজীদের একাধিক স্থানে এই আদেশ রয়েছে যে, যেখানে সম্ভবপর হয় ক্ষমার পন্থা অবলম্বন করা উচিত। কেননা, প্রকৃত উদ্দেশ্য হল চরিত্র সংশোধন এবং চরিত্র গঠন, প্রতিশোধ গ্রহণ নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, বিভিন্ন দেশ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসা এবং ন্যায়নীতির দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তা'লা কুরআন মজীদের সুরা হুজরাত-এর ১০ নম্বর একটি সোনালী নীতি বর্ণনা করেছেন। ' এবং যদি মো'মেনদের দুইদল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করাইবে; যদি (মীমাংসার পরে) তাহাদের উভয়ের মধ্যে হইতে একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করিয়া আক্রমণ করে তাহা হইলে তোমরা সকলে মিলিয়া যে বিদ্রোহ করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে। যদি সে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তোমরা তাহাদের উভয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সহিত মীমাংসা করাইয়া দিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।" এই সমস্ত নীতি বিশ্লেষণ করলে প্রমাণ হয় যে, সমগ্র মানবজাতির প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ তা'লা চাহেন, আমরা যেন সকলে শান্তির সাথে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরস্পর মিলেমিশে সমাজবন্ধ হয়ে বসবাস করি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যতদূর ধর্মীয় শিক্ষার সম্পর্ক, ইসলামী ধর্মবিশ্বাস ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পথিকৃত। ইসলামে প্রত্যেক ব্যক্তির কেবল নিজের ধর্মীয় স্বাধীনতাটুকু উপভোগ করার অনুমতিই নেই বরং তার নিজস্ব ধর্মের প্রচার ও প্রসার করারও ঢালাও অনুমতি আছে। ধর্ম এবং বিশ্বাস এই দুটি হৃদয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়। এই কারণে ধর্ম অবলম্বনের ক্ষেত্রে কোন বল প্রয়োগ নেই। অথচ আল্লাহ তা'লা ইসলামকে একটি সম্পূর্ণ ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তথাপি কাউকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করানোর কারোর অধিকার নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি সে যে কোন ধর্মের প্রতিই আকৃষ্ট হোক বা না হোক তার ইসলাম গ্রহণ করার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু মৌলিক বিষয় হল সে যেন ইসলাম স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করার এই সিদ্ধান্ত সে কোন চাপের মুখে না নেয়। অনুরূপেই সে যদি ইসলাম ত্যাগ করতে চায় তবে কুরআনী শিক্ষা অনুযায়ী এমন পুরুষ বা মহিলা ইসলাম ত্যাগ করার পূর্ণ অধিকার রাখে। যদিও আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস যে, ইসলাম একটি বৈশ্বিক ধর্ম এবং এর শিক্ষাবলী পূর্ণাঙ্গীন। তথাপি কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ত্যাগ করতে চাই তবে এটির তার ইচ্ছা এবং সে নিজেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার রাখে। সুরা মায়েদার ৫৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন, যদি তোমাদের মাঝে থেকে কেউ ধর্ম ত্যাগ করে চলে যেতে চাই তবে সে চলে যাক, আল্লাহ তা'লা তার স্থানে উন্নতর এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে নিয়ে আসবেন। সুতরাং তাকে কোন ধরণের শাস্তি দেওয়ার বা তার উপর কোন প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করার কোন সরকার বা সম্প্রদায় বা ব্যক্তির অধিকার নেই। সুতরাং, এটি সম্পূর্ণ ভুল এবং ভিত্তিহীন আরোপ যে, ইসলামে ধর্মত্যাগের কোনও শাস্তি আছে। ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হল আল্লাহ তা'লার সত্তা এবং আল্লাহ তা'লা সমগ্র মানবজাতির প্রভু-প্রতিপালক। এর অর্থ হল, যারা ইসলামের নামে কঠোরতা এবং অত্যাচারপূর্ণ কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তারা আল্লাহ তা'লাকে প্রভু-প্রতিপালক হিসেবে মান্য করে না। অথবা আল্লাহ তা'লা যে প্রভু-প্রতিপালক এ বিশ্বাস তারা রাখলেও কিন্তু বিষয়টি তাদের বোধগম্যের অতীত। এই কারণেই তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে।

হুযুর (আই.) বলেন, আমার নিকট এটি অত্যন্ত অন্যায় এবং নেতিবাচক পরিণামের জন্ম দিবে। এই ধরণের বৈশ্বিক সংকটের সময় আমাদেরকে এই মৌলিক নীতিটি স্মরণ রাখা উচিত যে, যাবতীয় প্রকারের মন্দ কর্ম এবং অন্যায়কে যেন দমন করা হয়, এবং প্রত্যেক প্রকারের পুণ্য কর্ম ও মানবিকতাকে প্রসার করা হয়। এইরূপে মন্দ কর্ম বেশিদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারবে না। পক্ষান্তরে পুণ্যের প্রসার ঘটবে এবং আমাদের সমাজকে সুন্দর করে তুলবে। যদি আমরা এই পুণ্যকে আরও বিস্তৃত করি তবে এইরূপে আমরা তাদের উপর জয়যুক্ত হতে পারব যারা শান্তি ও মানবতার উচ্চতর মূল্যবোধকে বিলুপ্ত করতে চায়। কিন্তু আমরা দেখি যে, পৃথিবীবাসী এই নীতিকে গ্রহণ করতে এবং বুঝতে সক্ষম নয়, এবং এই কারণেই মিডিয়া বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার উপর নিজেদের সংবাদপত্রের সার্কুলেশন বৃদ্ধি এবং দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টিকে বেশি প্রাধান্য দেয়। সেই মিডিয়া যারা মুষ্টিমেয় মানুষের অন্যায়-অত্যাচার প্রচার করে, বস্তুতঃ তারা দাঈশের মত অসৎ সংগঠনগুলির ষড়যন্ত্রকে সহায়তার দেওয়ার কারণ হচ্ছে। অথচ মিডিয়ার কর্তব্য হল পৃথিবীতে বিদ্যমান পুণ্যকর্মগুলিকে স্পষ্টরূপে তুলে ধরা। কিন্তু তারা এক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এটি একটি এমন অন্যায় যা আরও বেশি বিভাজন ও বিবাদের বীজ বপন করছে। বিশ্ব রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদকে পরাস্ত করতে হলে শান্তি প্রতিষ্ঠাকেই আমাদের পরম লক্ষ্যরূপে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এর জন্য সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। যদি আপনার মুসলমানের কথায় ভরসা না করেন তবে আমি আপনাদের সামনে কিছু বিশিষ্ট অ-মুসলিম ব্যক্তিত্বের বিবৃতি উপস্থাপন করব যারা রাজনীতিতে খ্যাতনামা এবং বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খী। উদাহরণ স্বরূপ যখন আমরা বলি যে, উগ্রপন্থাকে, বিশেষ করে দাঈশের মত সন্ত্রাসী সংগঠনকে কিভাবেব পরাস্ত করা যায় - এর উত্তরে অস্ট্রিয়ার বিদেশ মন্ত্রী সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমাদের প্রজ্ঞাপূর্ণ কার্যবিধির প্রয়োজন যার মধ্যে ইসলামিক স্টেটসের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সিরিয়ার সদর আসদকেও নিজেদের সাথে মিলিয়ে নিতে হবে। তিনি বলেন, আমার মতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং এটি রাশিয়া ও ইরানের মত বৃহত শক্তিগুলির সহায়তা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে প্রফেসর জন গ্রে, যিনি একজন প্রাক্তন রাজনীতিক দর্শনবিদ এবং যিনি লন্ডনের স্কুল অব ইকনমিক্সে দীর্ঘ সময় যাবৎ পড়িয়েছেন,তিনি সম্প্রতি 'বর্তমানের রাজনৈতিক অবস্থার উপর শান্তিকে প্রধান্য দান'-এর গুরুত্ব প্রসঙ্গে লিখেন যে, 'প্রশাসনিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হোক বা, একনায়কতন্ত্রী হোক, বাদশাহী হোক কিম্বা প্রজাতান্ত্রিক হোক, এবিষয়গুলি শান্তি প্রতিষ্ঠার তুলনায় অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়।

হুযুর (আই.) বলেন, আমার মতে এটি অত্যন্ত পরিণামদর্শী বিশ্লেষণ। তথাপি,বৃহত শক্তিগুলি সেই সব দেশগুলিতে শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যেখানে

শাসনব্যবস্থা পূর্বে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল। উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিমা দেশগুলি ইরাক থেকে সাদ্দাম হোসেনকে অপসারিত করার জন্য ব্যকুল ছিল। এই তের বছর ব্যপি যুদ্ধের বেদনাদায়ক পরিণাম আজও অনুভব করা যায়। আরও একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল লিবিয়ার যেখানে সদর কাযাফিকে ২০১২ সালে জোর পূর্বক পদচ্যুত করা হল এবং সেই সময় থেকে লিবিয়া অনবরত আইনহীনতা এবং ধ্বংসের পঙ্কিলে ডুবেই চলেছে। লিবিয়ায় এই রাজনৈতিক শুন্যতার সরাসরি পরিণাম এই হল যে, এখন সেখানে দাঈশ সন্ত্রাসের মজবুত ভিত্তি এবং জাল বিছিয়েছে এবং সে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এখন পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছে। আর এই বিপদ কেবল এই অঞ্চলের জন্যই নয় বরং ইউরোপের জন্যও ভয়ের কারণ রয়েছে যার সম্পর্কে আমি কয়েক বছর পূর্বেই সতর্ক করেছিলাম। এই কারণে এমন সব দেশে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনকে প্রাধান্য দেওয়ার পরিবর্তে এবিষয়টিকে নিশ্চিত করা আবশ্যক যে, জনসাধারণ যেন নিজেদের মৌলিক অধিকার পায় এবং দীর্ঘমেয়াদী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিরিয়ার প্রসঙ্গে ফিরে এসে আমি অস্ট্রিয়ার বিদেশ মন্ত্রীর এই মন্তব্যের সঙ্গে ঐক্যমত যে, শান্তি প্রতিষ্ঠাই পরম উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই কারণে বৃহত শক্তিগুলিকে সিরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্মুক্ত রাখা উচিত এবং অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহায়তাও অর্জন করা উচিত, এলাকায় যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, স্মরণ রাখুন! ইতিবাচক পরিবর্তন কেবল তখনই সম্ভব যখন ব্যপক স্বার্থের কারণে ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিগত স্বার্থের জলাঞ্জলি দেওয়া হয় সকল ক্ষেত্রে ন্যায় নীতি অবলম্বন করা হয়। যেরূপ আমি বলেছি।

ইসলাম বলে যে, ন্যায় নীতি হল সেই ভিত্তি যার উপর শান্তির ইমারত নির্মিত হয়। সুতরাং আমাদেরকে সময়ের আকস্মিক প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কয়েক বছর যাবৎ আমি সতর্ক করে আসছি যে, পৃথিবী আরও একটি বিশ্ব-যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর এখন অন্যান্য আরও অনেকেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। বস্তুতঃ অনেক বিশিষ্ট জনেরা একথা বলা আরম্ভ করেছে যে, তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। তথাপি আমি এখনও মনে করি যে, এই যুদ্ধকে থামানোর জন্য আমদের কাছে কিছু সময় আছে। কিন্তু এর জন্য ন্যায় নীতি অবলম্বন করা এবং নিজেদের বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থ ত্যাগ করা আবশ্যক। এরপূর্বে আমি বিভিন্ন সময় সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে অর্থ সরবরাহ করা বন্ধ করার বিষয়ে বলেছি। কিন্তু এখনও একথা বলা যেতে পারে না যে, এ প্রসঙ্গে যাবতীয় প্রচেষ্টা সম্পন্ন হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সাম্প্রতিককালের গবেষণামূলক প্রতিবেদন যা ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল-এ প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে, দাঈশ ইরাকের সেন্ট্রাল ব্যাংকের মাধ্যমে নীলামী থেকে বিশাল অঙ্কের আমেরিকান ডলার অর্জন করেছে। ইরাককে এই ডলার আমেরিকার ফেডেরাল রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছিল। এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, আমেরিকা প্রশাসন এবিষয়টি সম্পর্কে অন্ততপক্ষে ২০১৫ সালের জুন মাসে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিল। হুযুর আনোয়ার বলেন, ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি যে, বৃহত শক্তিগুলি এই ব্যবসা সম্পর্কে অনেকপূর্বেই অবগত ছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এছাড়াও তেল বিক্রয় সম্পর্কে সকলে এই বিষয়টি ভালভাবে জানে যে, বিভিন্ন সংগঠন এমনকি কিছু সরকারও দাঈশ-এর কাছ থেকে তেল ক্রয় করছে। এই ব্যবসা কেন বন্ধ করা হয় নি? এমন লেনদেনের ক্ষেত্রে কেন সম্পূর্ণরূপে নিষেধাজ্ঞা লাগু করা হয় নি? বোঝা গেল যে, যখন তেল অর্জন করার বিষয় আসে তখন সমস্ত নৈতিকতাকে উপেক্ষা করা হয়। এই বিষয়টিকে লন্ডনের কিংগস কলেজের প্রফেসর লেফ ওয়েনার সম্প্রতি একটি গবেষণামূলক পত্রে বর্ণনা করেন। তিনি লেখেন যে, পৃথিবী তেল অর্জন করার জন্য যাবতীয় অন্যায় -অত্যাচার সহ্য করার জন্য প্রস্তুত আছে। সুতরাং বিভিন্ন দেশ দাঈশ থেকেও তেল ক্রয় করেছে এবং সুডান থেকেও করেছে যেখানে মানবাধিকারকে দমন করা হয়েছে। এই বিষয়টি বাণিজ্য বাজারের মৌলিক নীতির পরিপন্থী যা অনুযায়ী সহিংসতার ফলে মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, সম্প্রতি ইরাকের এনার্জি ইনস্টিউট -এর প্রেসিডেন্ট একটি গবেষণাপত্রে বর্ণনা করেন যে, দাঈশ কিভাবে তেল বিক্রয় করে। তিনি লেখেন যে, ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে আম্বার প্রদেশ থেকে জর্ডান প্রদেশ তেল পাঠানো হয়, এবং কুর্দিস্তানের মাধ্যমে, ইরান ও মসুলের মাধ্যমে তুর্কি এবং সিরিয়ার স্থানীয় বাজারেও বিক্রয় করা হয়। অনুরূপভাবে ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলেও বিক্রয় করা হয়, যেখানে এর অধিকাংশ স্থানীয়ভাবে রিফাইন করা হয়। এই সব দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনবহিত থাকবে, একথা যুক্তিতে খাটে না। এই কারণে যখন দাবী করা হয় যে, সন্ত্রাসী এবং উগ্রপন্থীদের ধ্বংস করার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, তখন বাস্তব এই দাবীর সত্যতাকে অস্বীকার করে। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে দৃষ্টিপটে রেখে কিভাবে বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীতে প্রকৃত ন্যায় নীতি আছে।এটি কিভাবে দাবী করা যেতে পারে যে, সততা এবং বিশ্বস্ততা অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, অনুরূপভাবে সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী অস্ত্রের প্রসার প্রসঙ্গে মিডিয়ায় একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। সরকারী এভং নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন অনুসারে গত বছরে আমেরিকা ৪৬.৬ বিলিয়ন ডলার অস্ত্র বিশ্ব বাজারে বিক্রয় করেছে যা পূর্বের বছরের থেকে ১২ বিলিয়ন ডলার অধিক ছিল। এই প্রতিবেদনগুলিতে এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই অস্ত্র অধিকাংশই ঐ সকল দেশে বিক্রয় করা হয়েছে যেগুলি মধ্য প্রাচ্যে অবস্থিত। আর এইভাবে তারা সিরিয়া, ইরাক এবং ইয়ামান-এ যুদ্ধকে আরও উস্কে দিচ্ছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি পুনরায় বলছি যে, যদি এমন ব্যবসা চলতে থাকে তবে পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায় নীতি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? আমি যে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম, এগুলি প্রায় সকলেই জানা। আর এগুলি বিশিষ্ট বিশ্লেষক ও সমালোচকদের মতামত সম্বলিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যতক্ষন পর্যন্ত না সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে এবং জাতি সমূহের মধ্যেও ন্যায় নীতি লাগু করা হয় পৃথিবীতে আমরা প্রকৃত শান্তির আশা করতে পারি না। ন্যায় নীতি ছাড়া দাঈশ এবং তাদের গোত্রের অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে পরাস্ত করতে বছরের পর বছর ব্যায় হবে। কিন্তু যদি পৃথিবী এই বার্তার প্রতি মনোযোগ দেয় এবং ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং সন্ত্রাসীদেরকে অর্থ সরবরাহ বন্ধ করতে প্রকৃত অর্থেই চেষ্টা করে, তবে আমি মনে করি , সন্ত্রাসবাদের নেটওয়ার্ক অচিরেই ধ্বংস করা সম্ভব হবে। একজন অবসর প্রাপ্ত মার্কিন সেনাপতির বিবৃতির উল্টো, যিনি বলেছিলেন দাঈশের বিরুদ্ধে দশ থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, অবশেষে আমি বলতে চাই যে, আমার বিশ্বাস, যতক্ষণ পর্যন্ত না পৃথিবীবাসী নিজেদের সৃষ্টিকর্তাকে সনাক্ত করে এবং তাঁকে সমস্ত জগতের প্রভু-প্রতিপালক জ্ঞান করে প্রকৃত ন্যায় নীতি জয়যুক্ত হতে পারে না। শুধু তাই নয় বরং পৃথিবী একটি ভয়াবহ এবং ধ্বংসাত্মক পারমাণবিক যুদ্ধের সম্মুখীন হবে যার পরিণাম আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ভোগ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমার দোয়া হল এই যে, পৃথিবী যেন এই সত্যকে উপলব্ধি করে। আমি দোয়া করি, আমরা যেন মানবতার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে পারি এবং আমি এও দোয়া করি যে, প্রকৃত শান্তি যা ন্যায় নীতির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে, তা যেন পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বলে আমি আরও একবার আপনারা অতিথিদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা আজ এই সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'লা আপনাদের সকলের উপর স্বীয় কল্যাণ বর্ষিত করুন আমীন। অসংখ্য ধন্যবাদ॥

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।'" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মান সফর, ২০১২ (মার্চ, এপ্রিল)

ওয়াকফে নও ক্লাস

(পূর্ববর্তী সংখ্যার পর)

এই আযিমুশশান তাহরীকের সূচনাতেই হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) খোদা প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এই তাহরীকের অন্তর্ভুক্ত শিশুদের ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষার জন্য বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি ১৯৮৭ সালের ৩রা এপ্রিল তারিখের পর ১৯৮৯সালে চারটি জুমআর খুতবা প্রদান করেন, যেগুলিতে তিনি শিশুদের জন্মের অনেক আগে থেকে ভবিষ্যতের সমস্ত তরবীয়তী ধাপের বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ প্রদান করেন। একদিকে তিনি যেমন শিশুর পিতামাতার জন্য বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, তেমনি জামাতে সাংগঠিনক দিক থেকেও ওয়াকফে নও বিভাগ গঠন করেন, যেখানে তিনি চৌধুরী মহম্মদ আলী সাহেবকে ইনচার্জ হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৯৯২ সালে যথারীতি ওকালতে ওয়াকফে নও গঠিত হয় আর মহতরম চৌধুরী মহম্মদ আলী সাহেবকেই প্রথম উকিল ওয়াফ নও নিসেবে নিযুক্ত করা হয়। বর্তমানে মহতরম সৈয়্যদ কমর সুলেমান সাহেব ওয়াকফে নও এর উকীল হিসেবে সেবা করছেন।আর লন্ডনে এই বিভাগের ইনচার্জ হলেন মাননীয় ডক্টর শামিম আহমদ সাহেব।এই তাহরীক শুরুতে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কেবল দুই বছরের জন্য আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু জামাতের সদস্যদের ইচ্ছায় আরও দুই বছরের জন্য তা বৃদ্ধি করা হয়। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে, পরবর্তীতে হুযূর (রাহে.) এই তাহরীককে স্থায়ী রূপ দান করেন এবং ভবিষ্যতের পিতামাতারাও তাদের ভাবী সন্তানদের এই বরকতময় তাহরীকে অংশগ্রহণ করার তৌফিক লাভ করেছে।

খিলাফতে খামিসার শুরুতে এই তাহরীকের বয়স ছিল ষোলো বছর। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে, আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) খিলাফতের শুরুতেই ওয়াকফীন ও ওয়াকফাতে নওদের উপর তাঁর কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন আর তিনি ওয়াকফে নও ক্লাসের সূচনা করেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানেই সফরে গিয়েছেন, সেখানেই তিনি ওয়াকফীন ও ওয়াকফাতে নওদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তাদেরকে নিজের সঙ্গে নিয়ে ক্লাস করেছেন। জামাত আহমদীয়া জার্মানীতে হুযুর যে প্রথম সফরে আসেন, তখন সমস্ত ওয়াকফীন নও জলসা সালানার সময় হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে করমর্দন করার সৌভাগ্য লাভ করে। এরপর থেকে প্রায় প্রতি বছর যখনই হুযুর জার্মানী এসেছেন,ওয়াকফাত ও ওয়াকফীনে নওদের সঙ্গে নিয়ে ক্লাস করেছেন। এই ক্লাসে হুযুর ওয়াকফাত ও ওয়াকফীনে নওদের মূল্যবান উপদেশ দান করেন।

এই সব উপদেশাবলীতে হুযুর আনোয়ার একদিকে যেমন সন্তানের তরবীতের প্রতি পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তেমনি ওয়াকফাত ও ওয়াকফীনে নওদেরকে তাদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে সচেতন করেছেন। বিদেশ হওয়া ক্লাসগুলিতে হুযুর স্বয়ং তাঁর স্বশরীরী উপস্থিতি দ্বারা শিশুদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, কুরআন করীমের তিলাওয়াত, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই পুস্তক অধ্যায়ন এবং অন্যান্য তরবীয়তি বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শুধু তাই নয়, ওয়াফীনদের জাগতিক শিক্ষা সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন যে, তাদের কোন বিষয় নিয়ে পড়া উচিত এবং কোন ক্ষেত্রে যাওয়া উচিত।

বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজার ওয়াকফীন নও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে আর পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর একটি প্রজন্ম পরিণত হয়ে দ্বীনের সেবায় অবতীর্ণ হচ্ছে। আলহামদোলিল্লাহ আলা যালিক।

এখন আমাদের দায়িত্ব হল, আমরা যেন আমারেদের প্রিয় ইমামের দিকনির্দেশনা সর্বোতভাবে শিরোধার্য করি।এখন আমরা সেই বয়সে উপনীত হয়েছি, যখন আমরা অচিরেই আমাদের শিক্ষাজীবন শেষ করে ধর্মের সেবায় নিয়োযিত হব। সেই সময় আসছে যখন আমরা জামাতের প্রত্যাশা ও পিতামাতার বাসনা পূরণ করতে যাচ্ছি। এখন আমরা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মত বলব........। শুধু তাই নয়, আমরা তাঁর সুন্নতের পদাঙ্ক অনুসরণে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িতও করব। আল্লাহ্ করুন, আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে যেন সেই যোগ্যতা অর্জন করতে পারি যে, ইসলাম আহমদীয়াতের সেবা উৎকৃষ্ট সেবা করতে পারি।

প্রিয় হুযুরের নিকট সবিনয় আবেদন, আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন যেন খোদা তা'লা নিজ কৃপাগুণে আমাদেরকে এর তৌফিক দান করেন। আমীন।

ওয়াকফে নও এবং খিদমতে দ্বীন

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ওয়াকফে নও তাহরীকের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- আগামী একশ বছরের মধ্যে সর্বত্র যেমন ব্যপকহারে ইসলামের প্রসার ঘটবে তাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাস (ধর্মের সেবক)-এর প্রয়োজন হবে, যারা মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর খোদার দাস হবে।"

আলহামদোলিল্লাহ! জামাত আহমদীয়া জার্মানীও এই তাহরীকের শুরু থেকেই নিজেদের সন্তানদেরকে আল্লাহ্ তা'লার পথে ওয়াকফ করার তৌফিক পেয়েছে। এখন খোদা তা'লার কৃপায় মহম্মদ রসুলুল্লাহ্র খোদার এই গোলামদের সংখ্যা সাড়ে চার হাজারের বেশি। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তাহরীকের সূচনাতে একবার বলেছিলেন যে, আমার বাসনা, সারা পৃথিবী থেকে পাঁচ হাজারের একটি বাহিনী প্রস্তুত হোক। আল্লাহ্ তা'লা আজ সারা বিশ্বে সেই পাঁচ হাজারকে পঞ্চাশ হাজারে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন এমনকি একটি ছোট্ট দেশ জার্মানীতেই পাঁচ হাজারের বাহিনী প্রস্তুত হতে চলেছে।

খিলাফতের অনুরাগীরা অর্থাৎ জার্মানী জামাতের সদস্যরা প্রতিবছর প্রায় ১৮০ জন শিশুকে যুগ খলীফার নিকট পেশ করার তৌফিক পাচ্ছে। এরফলে এই মুহূর্তে জার্মানী জামাতে ওয়াকফীনে নওদের সংখ্যা হল ৪৫৯২জন, যাদের মধ্যে ১৯৬৮জন ওয়াকফাত (মেয়ে) এবং ২৬২৪জন ওয়াকফীন (ছেলে)। এদের মধ্যে ৫৫৬ জন শিশু, ৯৮৩জন আতফাল এবং ১০৮৫জন খুদ্দাম। আল্লাহ্র কৃপায় শিক্ষাক্ষেত্রেও ওয়াকফীনে নও শিশুরা অন্যদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। জার্মানীতে বিভিন্ন ধরণের স্কুলের প্রচলন রয়েছে। পঞ্চম শ্রেণী থেকে ত্রয়োদশ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলগুলিতে গিমনাযাইমকে সব থেকে উন্নত স্কুল মনে করা হয়। জার্মানীর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩০ শতাংশ ছাত্র গিমনযাইম স্কুলে শিক্ষার্জন করে। কিন্তু এই মুহূর্তে জামাত আহমদীয়া জার্মানীর ৫৫ শতাংশ ওয়াকফীন নও গিমনাযাইম স্কুলে শিক্ষালাভ করছে। ইনশাআল্লাহ্ আগামী কয়েক বছরে বহু সংখ্যক ওয়াকফীনে নও গিমনাযাইম পাশ করে ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করবে।

বর্তমানে ৭০জন ওয়াকফীনে নও জার্মানী, যুক্তরাজ্য ও কানাডার জামেয়াতে শিক্ষালাভ করছে আর তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন কর্মক্ষেত্রে যোগও দিয়েছে। অনুরূপভাবে দুশ'র বেশি ওয়াকফীনে নও ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষালাভ করছে, যাদের মধ্যে ১৬জন মেডিক্যাল, ৩৯ জন ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৩জন সাইন্স, ৪২জন কমার্স, ২১জন কম্পিউটার, ১০জন ল', ১৭জন আর্কিটেক্ট. ৮জন ইসলামিক স্টাডি এবং ৪জন শিক্ষকতা নিয়ে পড়াশোনা করছে। এছাড়াও আরও ১৬০জন ওয়াকফীনে নও বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছে।

প্রায় এক হাজার খুদ্দামদের মধ্য থেকে ৯০ শতাংশের বেশি ওয়াকফের নবায়ন করেছে এবং পিতামাতার অঙ্গীকার পালনের বিষয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং খোদা ও মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর দাসত্বের জোয়াল নিজেদের কাঁধে গ্রহণ করেছে এবং অঙ্গীকার করেছে যে, যুগ খলীফা যেখানে যে কাজের জন্যই আদেশ করুন না কোন, সেই আদেশ শিরোধার্য করাকে নিজেদের সৌভাগ্য মনে করবে। ইনশাআল্লাহ্ অচিরেই যুগ খলীফার এই খুদ্দামরা শিক্ষাজীবন শেষ করে নিজেদেরকে খলীফার কাছে সঁপে দিবে। এছাড়াও বহু খুদ্দাম তাদের পড়াশোনার পাশাপাশিও জামাতীয় এবং বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনগুলিতে সেবা করার তৌফিক পাচ্ছে। এটা আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ।

আলহামদোলিল্লাহ, ওয়াকফীনে নওদের এক বিরাট সংখ্যক ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিও আকৃষ্ট হচ্ছে। জামাত আহমদীয়া জার্মানীতে চার বছরের উর্দ্ধে ওয়াকফীনে নওদের ওয়াকালতে ওয়াকফে নও অনুমোদিত পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এবছর বাৎসরিক সমীক্ষায় ৯৮৫জন ওয়াকফীনে নও অংশগ্রহণ করেছিল। যাদের মধ্যে ৬৩ শতাংশ ওয়াকফীনে নও নিজেদের বয়স অনুপাতে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি পাঠ্যক্রম শেষ করেছে। পক্ষান্তরে ৩৪ শতাংশ ওয়াকফীনে নও নিজেদের বয়সানুপাতে পুরো পাঠ্যক্রম শেষ করেছে।

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 17 Oct, 2024 Issue No.42

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আমরা প্রতি বছর প্রিয় হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে ক্লাসে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করি এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভ করি ও তাঁর মূল্যবান উপদেশবাণী শোনার সুযোগ হয়। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্য। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত ওয়াকফে নও ক্লাসে প্রদত্ত নির্দেশাবলীও আমরা পেয়ে থাকি যেগুলি আল ফযলে প্রকাশিত হয়। এছাড়া যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত ক্লাসগুলি এম.টি.এ-তে সম্প্রচারিত হয়। এই সব ক্লাসে হুযুর আনোয়ার (আই.) ওয়াকফীনে নওদের জন্য নিত্যনতুন নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এই সব উপদেশাবলী আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা এবং সেগুলি পালন করা আমদের আবশ্যিক দায়িত্ব।

হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর নির্দেশাবলী

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনুষ্ঠান বেশ ভাল ছিল। কিন্তু আমার মতে, খুব কম ছেলেরাই হয়তো অনুষ্ঠান বুঝতে পেরেছে। কেননা তারা উর্দু বুঝতে পারে না। প্রথম কথা হল, কুরআন মজীদের যে অংশ তিলাওয়াত করা হয়েছে, তাতে হযরত ইসমাঈল (আ.)–এর শৈশবকালের কুরবানীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, তিনি নিজ পিতা অর্থাৎ হযরত ইব্রাহিম (আ.)কে বললেন, আল্লাহ তা'লা আপনাকে যেমনটি আমাকে কুরবানী করার আদেশ করেছেন আপনি তেমনটিই করুন। কুরবানীর এই স্পৃহা প্রতি শিশুর মধ্যে তখনই সৃষ্টি হতে পারে, যখন আপনারা ইতিহাস সম্পর্কেও কিছু জানবেন এবং ইতিহাস পড়বেন।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, কারা কারা হযরত ইব্রাহিম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)–এর ঘটনা পড়েছে? শিশুরা হাত তুললে হুযুর আনোয়ার বলেন– চার পাঁচ জন পড়েছে, বাকিরা কিভাবে জানবে? যাইহোক, প্রথম কথা হল, আমি ওয়াকফে নওদের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে 'ইসমাঈল' নামে একটি পত্রিকা শুরু করেছি আর এর নাম ইসমাঈল এই কারণেই রাখা হয়েছে। এর তৃতীয় বা চতুর্থ সংখ্যাও হয়তো এসে গেছে। পত্রিকাটি এখানে আসা উচিত আর এতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি এখানেও ছাপানো উচিত। অর্ধেকাংশ জার্মানীতে এবং অর্ধেকাংশ উর্দুতে প্রকাশিত হওয়া উচিত, যাতে এই সব শিশুরাও ওয়াকফে নও–এর গুরুত্ব বুঝতে পারে। পত্রিকাটি কেবল যুক্তরাজ্যের জন্যই নয়, বরং আমি সারা পৃথিবীতে এটি পাঠাতে বলেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজকের প্রোগ্রামে প্রথমে যে কুরআন করীমের তিলাওয়াত হয়েছে, সেখানে হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)–এর কুরবানীর উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে হযরত ইসমাঈল (আ.) এর কুরবানীর উল্লেখ রয়েছে। এরপর হাদীসে বলা হয়েছে যে,আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আমার অবস্থা সেই পথিকের ন্যায় যে যাত্রাপথে বিশ্রামের জন্য বিরাম দেয়।আজকাল তো যাতায়াতের অনেক মাধ্যম রয়েছে, গাড়িতে বসে বা জাহাজে বা ট্রেনে বসে যাত্রা করে। কিন্তু প্রাচীন যুগে মানুষ ঘোড়া কিম্বা উটের উপর যাত্রা করত। আর তখন মরুভূমিতে দূর দূরান্ত পর্যন্ত কোন গাছপালার দেখা মিলত না। আরবের এই দৃষ্টান্তই দেওয়া হয়েছে,কোথাও কোন গাছপালা বা ছায়া পাওয়া গেলে পথিকরা সেখানে বিশ্রাম করত। তোমাদের এখানে শীতকালে তুষারপাত হয়, তখন তোমরা হিটিং অন করে রাখ। গ্রীষ্মকাল এলে এসি অন করে নাও, পাখা চলতে শুরু করে। কিন্তু সেই যুগে পাখা ছিল না। সেই যুগের উদাহরণ দিয়ে আঁ হযরত (সা.) বলছেন, দেখ, তোমরা সফরে বের হলে যখন প্রখর রৌদ্র থাকে,বালু উত্তপ্ত হয়ে পড়ে আর তোমরা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবস্থায় কোন গাছের দেখা পাও, তখন সেই গাছের তলায় কিছুটা বিশ্রাম করার পর আবার যাত্রা শুরু কর। আঁ হযরত (সা.) বলছেন, আমার জীবনটাও ঠিক তদ্রূপ। জগতের বিষয় আশয় এবং সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যের বস্তুর সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই। আমি তো মানুষকে খোদার নিকট টেনে আনার জন্য এসেছি। মানুষকে ভালবাসা শেখাতে জগতে এসেছি আর এই সফর নিরন্তন। রাত্রে ঘুমাই আর বিশ্রাম করি, দুপুরে বসি সেইভাবে যেভাবে একজন পথিক কিছুটা পথ চলার পর গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয় তারপর সে পুনরায় পথ চলতে শুরু করে। (ক্রমশ......)

(৬পাতার পর.....)

প্রয়োজন ছিল যাতে আমরা একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারি এবং মানবতার সেবা করতে পারি।

*সাংবাদিক দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি এখানে পারস্পরিক শান্তির বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং শান্তির প্রসার ঘটাবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: আমাদের বার্তাই হল শান্তি ও ভালবাসার। আর এটিই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা। আমাদের প্রচেষ্টা হল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং পৃথিবীবাসীর সামনে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ তুলে ধরা। এই কাজটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর স্থানীয় মজলিসে আমলা এবং জামাতের পদাধিকারীগণ হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে গ্রুপ ফটো তোলেন। এরপর বেলা পাঁচটার সময় হুযুর আনোয়ার হোটেলে ফিরে যান। মসজিদ সংলগ্ন একটি উন্মুক্ত জায়াগায় তাঁবু খাটিয়ে মসজিদ বায়তুল আফিয়াতের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ৬টা ১৫ মিনিটে হুযুর আনোয়ার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন মাননীয় শাকীল আহমদ সাহেব, মুবাল্লিগ সিলসিলা। এবং তিলায়াতকৃত অংশের জার্মান অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

* এরপর আব্দুল্লাহ্ ওয়াগাস হাউযার সাহেব, আমীর জামাত জার্মানী, পরিচিতি জ্ঞাপন মূলক বক্তব্য রাখেন। আমীর সাহেব অতিথি বর্গকে স্বাগত জানিয়ে এই শহরের পরিচিতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন এখানকার কাউন্টি ওয়াল্ডশাট টিনজেন-এর জনসংখ্যা এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার। এবং এই ওয়াল্ডশাট শহরের জনসংখ্যা হল ২৪ হাজার। এই শহর জার্মানীর প্রাচীনতম শহরগুলির মধ্যে একটি। ১২৫৬ সালে এই শহরের গোড়াপত্তনের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই শহরের একটি অংশ জার্মানীল বিখ্যাত জঙ্গল 5cWARZWALD এ অর্থাৎ ব্ল্যাক ফরেস্টে এবং অপর প্রান্তটি সুইজারল্যান্ডের সীমানায় গিয়ে মিলেছে। ওয়াল্ডশাট শহর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৪৬ মিটার উচ্চতায় অবস্থান করছে। এই শহরে ১৯৮৫ সাল থেকে আহমদীদের বসতি স্থাপন আরম্ভ হয় এবং ১৯৮৬ সালে রীতিমত জামাত অস্তিস্ত লাভ করে। জামাত এখানে খিদমতের কাজে অগ্রণী থাকে। প্রত্যেক বছর বছরের শুরুতে জামাত শহরটিকে পরিস্কার করে। মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে আমীর সাহেব বলেন- শহরের ব্যবস্থাপনা আমাদেরকে স্বাগত জানিয়েছে। নির্মাণকালে স্থানীয় প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ অত্যন্ত উদরতার পরিচয় দিয়ে জামাতকে নিজেদের জায়গায় জুমার নামায ও ঈদের নামায পড়ার ব্যবস্থা করে দেয়। মসজিদ বায়তুল আফিয়াত যেখানে নির্মিত হয়েছে সেই জায়গায় পূর্বে একটি মার্কেট ছিল। জমিটির আয়তন ১৮৮ বর্গমিটার যা এক লক্ষ ১৮ হাজার ইউরোর বিনিময়ে ক্রয় করা হয়েছে। ২৩ শে মার্চ ২০১৬ সালে মসজিদ নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এবং ২০১৭ সালের ১০ ই এপ্রিল নির্মাণ সম্পন্ন হয়। মসজিদের দুটি হলঘর রয়েছে। যেগুলির আয়তন ১০১.৭ বর্গমিটার। মিনারের উচ্চতা ৭ মিটার। মহিলা ও পুরুষদের জন্য দুটি পৃথক পৃথক হলঘর ছাড়াও একটি অফিস বানানো হয়েছে এবং একটি রান্নাঘরও তৈরী করা হয়েছে।

* আমীর সাহেবের বক্তব্যের পর লর্ড মেয়রের প্রতিনিধি সিলভিয়া ডোবল সাহেবা নিজের বক্তব্য রাখেন। তিনি সিটি কাউন্সিলের মেম্বার এবং সোশাল পার্টি এস.ডি.পি-রও মেম্বার। তিনি বলেন: মহাসম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! আমি সর্ব প্রথম খলীফাতুল মসীহকে স্বাগত জানাই এবং লর্ড মেয়রের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এই কারণে যে, তিনি অন্য একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে গেছেন। যে জন্য তিনি এখানে আসতে পারেন নি। আমি নতুন মসজিদ নির্মাণের জন্য আপনাদের সাধুবাদ জানাই। এই মসজিদটি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। বাহ্যিকভাবে চিন্তাভাবনা করার জন্য এবং আত্মপর্যালোচনা করার জন্য এই ভবনটি অত্যন্ত উপযুক্ত মনে হচ্ছে। আমি শহরের মানুষদের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এই জন্য যে, আপনি আমাদের জন্য মসজিদ দেখার সুযোগ আপনাদের রীতি রেওয়াজ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ তৈরী করে দিয়েছেন। আমি মনে করি এই মসজিদরূপে আপনি আমাদের শহরকে একটি হীরকখণ্ড উপহার দিয়েছেন। মসজিদ নির্মাণ হওয়ার পূর্বে যারা এই ভবনটির দশা দেখেছিল তারা এখন নিশ্চয় আনন্দিত হবে যে, এই ভবনটিকে একটি সুন্দর মসজিদের রূপ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমি এই জন্য

(এরপর ৭ পাতায়.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir